ওঁতৎসৎ।

হিতৈষণা-গ্রন্থাবলী—২২

আর্ট ও সাহিত্য।

আদিব্রাহ্মসমাজের এবং তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার
সম্পাদক
শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর তত্ত্বনিধি, বি-এ
কর্ত্তৃক বিরচিত
এবং
মাইকেল মধুসূদনের মেঘনাদবধ কাব্যের
অভিনব সংস্করণ সম্পাদক
রায়বাহাদুর ডাক্তার শ্রীযুক্ত দীননাথ সান্যাল
মহাশয়ের ভূমিকা সম্বলিত।

[মূল্য ১৲ এক টাকা মাত্র

কলিকাতা

৫৫ আপার চিৎপুর রোড, আদিব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রালয়ে

শ্রীরণগোপাল চক্রবর্ত্তী দ্বারা মুদ্রিত

ও

৫০২৩ কলিগতাব্দে ১৯৭৯ সম্বতে ১৮৪৪ শকে ১৩২৯ সালে

৯৩ ব্রাহ্মসম্বতে মকররাশিস্থ ভাস্করে মাঘমাসে অষ্টম

দিবসে সোম বাসরে শুক্লপক্ষে শুভ শ্রীপঞ্চমী

তিথিতে প্রকাশিত হইল।

আর্ট সম্বন্ধীয় গ্রন্থাদির তালিকা।

গ্রন্থ বা প্রবন্ধের নাম	রচয়িতার নাম
১। সাহিত্যের স্বাস্থ্যরক্ষা— রায় কবিরঞ্জন শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সিংহ বাহাদুর, B-A.	
২। Art	Lord Bacon
৩। সাহিত্যের দায়িত্ব	ভারতী ফাল্গুন ১৩২৪।
৪। Art	Emerson
৫। সাহিত্যসৃষ্টি ও স্বাভাবিকতা— শ্রীযুক্ত প্রকাশচন্দ্র দত্ত (নারায়ণ, মাঘ ১৩২৬)	
৬। সাহিত্য	শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
৭। আধুনিক সাহিত্য	শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
৮। Music & Morals	Rev. H. R. Haweis M-A.
৯। What is Art	Tolstoy.
১০। Discourses on Art	Sir Joshua Reynolds.
১১। Art and Religion—	James H. Luba (The Indian Messenger Sept. 30, 1917)
১২। সাহিত্যে আর্ট ও নীতি	মালঞ্চ বৈশাখ ১৩২৪।
১৩। আর্ট ও ধর্ম্ম	ভারতবর্ষ ফাল্গুন ১৩২৮।

১৪। Essential in Art — Statesman 5. 1. 22.

১৫। Art and History — The Hibbert Journal April 1918.

১৬। আর্ট ও নীতি — বামাবোধিনী পৌষ ১৩২৮।

১৭। William Shakespeare—Victor Hugo.

উৎসর্গ-পত্র।

যাহাদের মঙ্গলের উপর দেশের কল্যাণ সর্ব্বতোভাবে নির্ভর করিতেছে, আমার প্রাণপ্রিয় সেই দেশের ছেলেমেয়েদের হাতে এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানি সমর্পণ করিলাম। ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি, তাহারা এই গ্রন্থের মূল ভাব প্রাণের ভিতর ধারণ করিয়া নিজেরাও কল্যাণের পথে অগ্রসর হউক, এবং দেশমাতাকে জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আসনে অধিষ্ঠিত করুক।

শুভার্থী
শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

নিবেদন।

আজ বৎসরাধিক হইতে চলিল, সুহৃদ্বর শ্রীযুক্ত যতীন্দ্র মোহন সিংহ কবিরঞ্জন মহাশয় তাঁহার "সাহিত্যের স্বাস্থ্যরক্ষা" গ্রন্থের প্রবন্ধগুলি ধারাবাহিক আকারে "সাহিত্য" পত্রে প্রকাশ করিতেছিলেন। "সেই সময়ে প্রবন্ধগুলি পাঠ করিয়া যে আরাম ও আনন্দ অনুভব করিয়াছিলাম, পূতিগন্ধপূর্ণ গৃহে সহসা সুবিমল প্রভাতবায়ু প্রবেশ করিলে যে আরাম ও আনন্দ পাওয়া যায়, একমাত্র তাহারই সহিত উহার তুলনা হয়।" তাঁহার প্রবন্ধগুলির মধ্যে একটী আমার :এতই ভাল: লাগিয়াছিল যে, আমি উপযাচক হইয়া তাঁহার সহিত আমার মতের ঐক্য জানাইয়াছিলাম ; সেই সূত্রে পত্রব্যবহারের ফলে আমার উপর তাঁহার গ্রন্থের ভূমিকা লিখিবার ভার সন্ন্যস্ত হয়। সেই ভূমিকা লিখিতে গিয়া আলোচনার ফলে বর্ত্তমান সাহিত্যের মতিগতি বিষয়ে আমার দৃষ্টি বিশেষভাবে খুলিয়া গেল। তখন দেখিলাম যে, উক্ত ভূমিকাতে বক্তব্য বড়ই সংক্ষেপে শেষ করিতে হয়, অনেকটাই বাকী থাকিয়া যায়। সেই কারণে আমার অবশিষ্ট কতকগুলি বক্তব্য এই গ্রন্থের আকারে প্রকাশ করিলাম। ভগবান অসম্ভবকে সম্ভব করিলেন।

ছাপাইবার পূর্ব্বে গ্রন্থের প্রুফগুলি দেখিয়া দিবার জন্য সুহৃদ্বর যতীন্দ্রবাবুকে অনুরোধ করি—আশা এই যে, যদি কোন ভুলভ্রান্তি থাকে, তিনি তাহা সংশোধন করিয়া দিবেন।

তিনি তাঁহার দৈনিক কাজের মধ্যেও কেবল নিজে নহে, আবার যথেষ্ট কষ্ট স্বীকার পূর্ব্বক মাইকেল মধুসূদনের অভিনব সংস্করণসম্পাদক সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক রায় বাহাদুর দীননাথ সান্যাল মহাশয়ের সহিত মিলিত হইয়া, প্রুফগুলি যে প্রকার তন্ন-তন্ন ভাবে দেখিয়া দিয়াছেন এবং গ্রন্থপ্রকাশে উৎসাহিত করিয়াছেন, তাহার জন্য আমি একমুখে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া শেষ করিতে পারি না। সান্যাল মহাশয়ও সাহিত্য-সম্রাটদ্বয় বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের সমালোচনায় আমার সহিত তাঁহার ঐকমত্য জানাইয়া যে সাহস দিয়াছেন, তাহার জন্য তাঁহারও নিকট আমি চিরঋণী। আমি কৃতজ্ঞতাভরে অবনত হইয়া আমার এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানিকে একটী ভূমিকা দ্বারা সমলঙ্কৃত করিবার জন্য তাঁহাকে অনুরোধ করিলাম। তিনিও তাঁহার বর্ত্তমান শারীরিক অবস্থা তুচ্ছ করিয়া একটী ভূমিকা লিখিয়া দিয়াছেন। সেই ভূমিকা দ্বারা যে কেবলমাত্র আমার গ্রন্থের গৌরব শতগুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে এমন নহে, এই ভূমিকা আমাদের পরস্পরের মধ্যে রাখীবন্ধনের কার্য্য করিল।

একটী কথা এইস্থলে বলিয়া রাখা আবশ্যক। কয়েকজন প্রবীণ সাহিত্যিক আমার গ্রন্থ আদ্যোপান্ত শ্রবণ করিয়া বলেন যে, আমি একালের উপন্যাসমাত্রকেই পাঠের অনুপ-যুক্ত বলিতেছি, এই প্রকার একটা ভ্রান্ত ধারণা আসিতে পারে। কিন্তু আমি সাহসপূর্ব্বক বলিতে পারি যে, আমার

গ্রন্থখানি অবহিত হইয়া পাঠ করিলে, এ ধারণা কখনই আসা উচিত নহে। আমি একালের উপন্যাসের বর্ত্তমান ধারায় আঘাত পাইয়াই গ্রন্থখানি লিখিয়াছি; কাহারও সহিত সংগ্রাম-ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া বিবাদ করিবার জন্য লিখি নাই। সেই কারণে ইচ্ছা পূর্ব্বক আমি একালের উপন্যাসের কোনটীরই, বলিতে গেলে, বিশেষভাবে সমালোচনা করি নাই। শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সিংহ, শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্র প্রসাদ ঘোষ, শ্রীযুক্ত জলধর সেন প্রভৃতি সুলেখকদিগের এবং সাধারণত মহিলাদিগের অনেক উপন্যাস যে খুব উচ্চ দরের, তাহা আমি শতবার স্বীকার করিব। কিন্তু অধিকাংশ একালের উপন্যাসলেখক আজকাল উপন্যাস লিখিবার যে ধারা অবলম্বন করিয়াছেন, তাহার ফলে আমাদের দেশের, আমাদের জাতির সর্ব্বনাশ ও ধ্বংস নিশ্চিত, এই ধারণাবশত অনেক সময়ে আমার হৃদয় কাঁপিয়া উঠে বলিয়াই আমি এই গ্রন্থ প্রকাশ করিতেছি। ইহার ফলে যদি কাহারও মনে আমি এতটুকু আঘাত দিয়া থাকি, তবে তাহার জন্য আমি তাঁহার চরণ ধরিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি, তিনি, আশা করি, আমাকে ক্ষমা করিবেন। সেকালের উপন্যাসের মধ্যে ৺তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের স্বর্ণলতা প্রভৃতি দেশের প্রকৃত প্রকৃতি-প্রকাশক গ্রন্থগুলির উল্লেখ পরিত্যাগ করিয়াছি বলিয়া কোন কোন বন্ধু, এমন কি, সান্যাল মহাশয়ও আশ্চর্য্য হইয়াছেন। তারকবাবুর যদি একটী গ্রন্থও আলোচনাস্থলে

উপস্থিত করিতাম, তবে সেকালের আরও অনেক ঔপন্যাসি-কেরও গ্রন্থ কেন উপস্থিত করিলাম না, তাহার কৈফিয়ৎ পদে পদে দিতে হইত। তাহা অপেক্ষা দুই সাহিত্যসম্রাটের গ্রন্থ আলোচনা করিয়া আমার বক্তব্য বুঝাইয়া দেওয়াই শ্রেয়স্কর বিবেচনা করিয়া, সেই নিষ্কৈফিয়ৎ পথেরই পথিক হইয়াছি।

এই গ্রন্থের অধিকাংশ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের ছাত্রসমাজের এক অধিবেশনে গত ১৫ই পৌষ দিবসে পাঠ করিবার অধিকার আমাকে দেওয়া হইয়াছিল, তজ্জন্য ছাত্রসমাজকে আমি বিশেষ-ভাবে কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি।

গ্রন্থের উপসংহারে উপন্যাসলেখকদিগের প্রতি যে নিবেদন করিয়াছি, এই নিবেদনেরও উপসংহারে তাঁহাদের প্রতি কর-যোড়ে সেই নিবেদনই করিতেছি—তাঁহারা কাহারও দোহাই দিয়া অশ্লীল ইঙ্গিতপূর্ণ উপন্যাস প্রকাশ করিয়া দেশের সর্ব্বাঙ্গে যেন আর বিষক্ষত উৎপাদন না করেন। তাঁহাদের চরণে প্রণিপাত পূর্ব্বক এই ভিক্ষা চাহি যে, দেশের ছেলেমেয়েদিগকে ব্রহ্মচর্য্যের উপর দাঁড়াইয়া দ্রঢ়িষ্ঠ বলিষ্ঠ হইবার একটুখানি অবসর দিন।

৫।১ বি, বারাণসী ঘোষের সেকেণ্ড লেন,
যোড়াসাঁকো,—সিংহবাজার,
কলিকাতা।
১৩২৯, ৮ মাঘ; ১৯২৩, ২২ জানুয়ারি
সোমবার।

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

ভূমিকা।

আরম্ভেই ভূমিকার একটু ভূমিকা করা আবশ্যক, মনে করিতেছি। কিছুকাল পূর্ব্বে আমার বন্ধুবর শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সিংহ মহাশয় যখন "সাহিত্যের স্বাস্থ্যরক্ষা" সম্বন্ধে লিখিতে-ছিলেন, তখন হইতে আমাদের উভয়ের মধ্যে প্রায়ই ঐ বিষয়ে কথোপকথন হইত। ইহারই কিছুদিন পরে যখন বঙ্গসাহিত্যে লব্ধপ্রতিষ্ঠ, চিন্তাশীল লেখক শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় তাঁহার রচিত এই "আর্ট ও সাহিত্য" গ্রন্থখানির মুদ্রণলিপি দেখিয়া দিবার জন্য সিংহ মহাশয়ের কাছে পাঠাইতে লাগিলেন, তখন সিংহ মহাশয় উহা আমার সহিত একত্র হইয়া দেখিবার ইচ্ছা করিলে, আমি আগ্রহের সহিত তাঁহার ঐ কার্য্যে যোগ-দান করি। ক্রমে যতই অগ্রসর হওয়া গেল, ততই দেখিলাম যে, ঠাকুর মহাশয় এ বিষয়ে সর্ব্বতোভাবে আমার সমানধর্ম্মা— এমন কি, এই গ্রন্থে বিচারিত কোন কোন গ্রন্থসম্বন্ধে আমি পূর্ব্বে সিংহ মহাশয়ের কাছে আমার যে-সকল মত সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করিয়াছিলাম, দেখিলাম ঠাকুর মহাশয়ও সেই-সেই গ্রন্থ সম্বন্ধে অবিকল সেইরূপ মতই তাঁহার এই গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। সিংহ মহাশয় আমার সম্বন্ধে এই সকল কথা ঠাকুর মহাশয়কে জানাইলে, তিনি তাহাতে আনন্দ প্রকাশ করিয়া, আমার সহিত পূর্ব্বপরিচয় না থাকিলেও, আমাকে পত্র লিখেন এবং সুধু আনন্দ করিয়াই ক্ষান্ত না থাকিয়া, আমাকে তাঁহার

এই গ্রন্থখানির একটী ভূমিকা লিখিবার জন্য সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করেন।

সাহিত্যিক সখ্য বড়ই মধুর ও রসাল সামগ্রী। এই রসের গুণেই, এ পর্য্যন্ত চাক্ষুষ পরিচয় না থাকিলেও, তিনি আমাকে চিরপরিচিতের ন্যায় মনে করিয়া উদার প্রাণে আমাকে ঐ অনুরোধটী করিয়াছেন এবং আমিও ঐ রসের মাধুর্য্যেই নিজের অযোগ্যতার কথা না ভাবিয়াই, যেন মন্ত্রমুগ্ধ হইয়া, তাঁহার মত সুলেখকের লিখিত, সুচিন্তিত এই গ্রন্থখানির এই যৎসামান্য ভূমিকাটী লিখিতে কুণ্ঠিত হই নাই।

সংস্কৃত সাহিত্যশাস্ত্রে সাহিত্যের স্থান অতি উচ্চে। সৎসাহিত্যের সাধনা ও আলোচনা চতুর্ব্বর্গ-ফলপ্রদায়িনী বলিয়া কথিত হইয়াছে। তপস্যার পথ দুর্গম ও দুষ্কর; কিন্তু সাহিত্যের পথ সুগম ও সুকর। তপস্যা নীরস; সাহিত্য সরস। তপস্যার পথ কঠোর; কিন্তু সাহিত্যের পথ সর্ব্বথা সৌন্দর্য্যমণ্ডিত। এইজন্যই সংস্কৃত সাহিত্যশাস্ত্রকারগণ বলেন যে, পরিণতবুদ্ধি ব্যক্তি নীরস বেদাধ্যয়নাদি করিয়া অতি কষ্টে যে চতুর্ব্বর্গ ফল প্রাপ্ত হয়েন, সুকুমারমতি তরুণবয়স্ক ব্যক্তি সাহিত্যসাধনে ও কাব্যরসাস্বাদনে সহজেই সেই ফল লাভ করিয়া মানবজীবন সফল ও সার্থক করিতে পারেন। পুরাণাদিতেও সাহিত্যের উপাদেয়ত্বের উল্লেখ দেখা যায়। কোন পুরাণ কাব্যালাপকে বিষ্ণুর অংশ বলিয়া অভিহিত করিয়া, সাহিত্যকে মহিমান্বিত ও

গৌরবমণ্ডিত করিয়াছেন। এই হইল সংস্কৃতে সাহিত্যাদর্শ; এবং কালজয়ী সংস্কৃত কাব্য-নাটকাদি ঐ আদর্শের নিদর্শনস্বরূপ।

প্রাচীন বাঙ্গালায় গদ্য-সাহিত্য ছিল না;—ছিল কেবল কাব্যাকারে ধর্ম্মসাহিত্য। ইংরেজী-শিক্ষার সঙ্গে-সঙ্গে গদ্যসাহিত্যের সৃষ্টি হইল এবং বঙ্গসাহিত্যে গদ্যকাব্য (উপন্যাস) দেখা দিল। "আলালের ঘরে দুলাল" বাঙ্গালার প্রথম উপন্যাস হইলেও, এখন যে ভাষায়, যে ভাবে, যে ধরণে, যে উপকরণে এবং যে আদর্শে অধিকাংশ উপন্যাসরাজি রচিত হইতেছে, তাহার জন্মদাতা নব্যবঙ্গের সাহিত্যিক-চূড়ামণি বঙ্কিমচন্দ্র। বঙ্কিমচন্দ্র তখন বিলাতী প্রভাবে প্রভাবিত। সুতরাং তিনি তাঁহার উপন্যাসের আদর্শ লইলেন পাশ্চাত্য দেশ হইতে। উপন্যাসের প্রধান উপাদান-বস্তু নরনারীর প্রেম। তাই দেখিতে পাই, পাশ্চাত্য আদর্শের সঙ্গে পাশ্চাত্য উদ্দাম প্রেমলীলাও বাঙ্গালার উপন্যাস-সাহিত্যে নানা ভাবে, নানা ছাঁদে প্রকটিত হইতে আরম্ভ করিল। সুদক্ষ শিল্পীর হাতে, দেশী ছাঁচে ঢালা হইলেও, তাহার বিদেশী ভাব, বিদেশী ছন্দ, বিদেশী গন্ধ এবং সর্ব্বোপরি প্রবৃত্তিমূলক প্রেমের তীব্র মাদকতা, মনোজ্ঞ ভাষায় ও মনোহর বর্ণনায় মণ্ডিত হইয়া বঙ্গের পাঠক-পাঠিকাদিগের মস্তিষ্কে বেশ একটু গোলাপীগোছের উন্মাদনার সৃষ্টি করিল। প্রাচীন ভারতের সেই নিবৃত্তিমূলক ধর্ম্ম, নিবৃত্তিমূলক সমাজ, নিবৃত্তিমূলক

আচার-অনুষ্ঠান বহুকালের স্তূপীকৃত আবর্জ্জনায় শ্রীভ্রষ্ট, লক্ষ্যভ্রষ্ট, আদর্শভ্রষ্ট ও জীবনীশক্তিহীন হইয়া পড়িয়াছিল। ভারতীয় আদর্শের প্রতিষ্ঠা করিয়া, লক্ষ্যের সন্ধান করিয়া সংস্কার করিলে, এবং আবর্জ্জনা বর্জ্জন করিয়া, তাহার স্থলে সত্য, জ্ঞান ও নিবৃত্তির আবাদ করিলে হয়তো সোনা ফলিতে পারিত। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্যবশে তাহা হয় নাই। যাঁহারা ইংরাজিতে সুপণ্ডিত হইতে লাগিলেন, তাঁহাদের অধিকাংশই মুখ ফিরাইলেন পাশ্চাত্যের দিকে। তাঁহারা সকল বিষয়েই আদর্শ লইতে লাগিলেন বিলাতী। এমত স্থলে একা সাহিত্যই বা বাদ পড়িবে কেন? উপন্যাসও বিলাতী আদর্শে রচিত হইতে লাগিল এবং রোচক বলিয়া প্রবৃত্তির মুখে বঙ্গীয় পাঠক-পাঠিকাবর্গ গোগ্রাসে তাহা গ্রহণ ও গলাধঃকরণ করিয়া তৃপ্তি বোধ করিতে লাগিল।

উপন্যাসের ঐ ধারা, যাহা বঙ্কিমচন্দ্র ধরাইয়া গেলেন, এখন সেই ধারাই শতধারায়, সহস্রধারায় বিক্ষিপ্ত হইয়া বাঙ্গালা-সাহিত্য প্লাবিত করিয়া ফেলিতেছে। আজকাল এই যে, বঙ্গের কুলকন্যা ও কুলবধূগণ দেবসেবা, গৃহসেবা, শিশুসেবা, সমাজ-সেবা ইত্যাদি শতবিধ অবশ্যকর্ত্তব্য কর্ম্মের অবহেলা করিয়া, কামকলার নিত্যনূতন উপন্যাস-পাঠও তাঁহাদের নিত্যনূতন বিলাসকলার অঙ্গীভূত করিয়া লইয়াছেন; এই যে স্কুল-কলেজের সুকুমারমতি ছেলেরা ঐ অপূর্ব্ব সাহিত্যের বিচিত্র

প্রেমলীলায় ঝাঁঝালো আদিরসে ভরপূর হইয়া, যৌবনকে যেন ডাকিয়া আনিতে চাহিতেছে ;—আর এই যে ত্রিতাপ-ক্লিষ্ট কেরাণীকুল ঐ সাহিত্যের নেশায় তাঁহাদের অবসন্ন মনকে কথঞ্চিৎ উত্তেজিত করিবার জন্য নব নব উপন্যাসকে তাঁহাদের অবসর-সহচর করিয়া তুলিয়াছেন ;—ইহা যে মঙ্গল-জনক নহে, ইংরাজীশিক্ষিতদের মধ্যেও এইরূপ একটা লোক-মত ক্রমশই প্রবল হইয়া উঠিতেছে, এ কথা অস্বীকার করিবার জো নাই।

কাব্যকলায় আদিরস পরম উপাদেয় ও উপভোগ্য বলিয়া পরিগণিত। রস-শাস্ত্র উহাকে "বিষ্ণুদৈবত" বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। ইহাতেই ঐ রসের পবিত্রতা সূচিত। ঐ রসের নামান্তর "উজ্জ্বল রস"—ইহাতেই উহার উপভোগ্যত্ব সুব্যক্ত। উত্তম-প্রকৃতি নায়ক-নায়িকা অবলম্বনে ঐ রসের পরিস্ফুটন করাই বিধি এবং তাহাই শোভন। বঙ্গের একজন সুপ্রসিদ্ধ আলঙ্কারিক, পণ্ডিত জয়গোপাল গোস্বামী মহাশয় তাঁহার প্রণীত কাব্যদর্পণের ভূমিকায় বলিয়াছেন—"আদ্যরসের উল্লেখ করিতে হইলেই যে লেখনী ঘৃণাকর ও লজ্জাজনক বিষয়সকল উদ্গীর্ণ করিবে, ইহা কেবল ভ্রান্তিবিলসিত। যেরূপ ঋতুর মধ্যে বসন্তঋতু ঋতুরাজ বলিয়া আদরণীয়, নবরসের মধ্যে নিরা-বিল আদ্যরসও সেইরূপ আদরণীয়।" কিন্তু বাঙ্গালার অধিকাংশ উপন্যাসেই এ আদর্শ রক্ষিত হয় নাই, হইতেছেও

না। "আর্ট"বাদীরা কি বলিতে চাহেন যে, নির্ম্মল ও পবিত্র দাম্পত্যপ্রেমে কাব্য-শ্রী নাই বা হইতে পারে না? যত কাব্য-শ্রী ফুটিয়া উঠে কেবল গণিকা, ক্ষণিকা, পরকীয়া ও নরকীয়া প্রভৃতির প্রেমে? তাঁহারা কি জানেন না বা মানেন না যে, সামাজিক ধর্ম্ম প্রেমের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং সতীত্বধর্ম্ম বা দাম্পত্যপ্রেমই সকল প্রকার প্রেমের মূলাধার। ইহাকে আশ্রয় করিয়াই স্নেহ, ভক্তি, প্রীতি প্রভৃতি প্রথমে গৃহে অঙ্কুরিত হয়; এবং ক্রমে আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, স্ব-সমাজ ও স্ব-দেশ আলিঙ্গন করিয়া, অবশেষে জগতে ব্যাপ্ত হইতে চায়। এই দাম্পত্যপ্রেমের উৎকর্ষেই সন্তানের উৎকর্ষ, গৃহের উৎকর্ষ; সুতরাং সমাজের উৎকর্ষের মূলও উহাই। এই প্রেম নষ্ট কর, দেখিবে, গৃহ থাকিবে না,—সব ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইবে। গৃহ না থাকিলে, সমাজ কোথায় থাকে? কোন্ ইতিহাসাতীত যুগে, যে দিন মানুষ গৃহ বাঁধিয়া তাহাতে গৃহিণী-স্থাপনা করিয়াছিল, সেই দিন হইতেই অনুকূল ক্ষেত্র পাইয়া মানব-হৃদয়ের এই প্রেম-বীজ অঙ্কুরিত হয়। তার পর, যুগ-যুগান্তরের লালন-পালনে বদ্ধমূল ও বর্দ্ধিত হইয়া এবং শাখা-প্রশাখায় প্রসারিত হইয়া, নানা ভাবে নানা আকারে উহা এখন সমাজব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে। স্নেহ বল, ভক্তি বল, প্রীতি বল, মৈত্রী বল, সহৃদয়তা বল,—সকল সামাজিক ধর্ম্মের মূলই ঐ। গৃহে ইহার জন্ম, সমাজে ইহার ব্যাপ্তি, এবং পরি-

শেষে পরম প্রেমময়ের পাদমূলে ইহার পরিসমাপ্তি। যে বিশ্বপ্রেম প্রেমিকের চরম আদর্শ, গার্হস্থ্যধর্ম্মেই তাহার দীক্ষা, সমাজধর্ম্মেই তাহার সাধনা এবং দেবত্বলাভেই তাহার সিদ্ধি। এই দাম্পত্যপ্রেমই মাতৃত্বকে মহিমামণ্ডিত করিয়া অতি দীনহীনের গৃহকেও স্বর্গতুল্য করিয়া থাকে। আর্ট-বাদীরা কি বলিতে চাহেন, এ হেন প্রেমে কাব্য-শ্রী নাই? কত সহস্র সহস্র বৎসরব্যাপী বিবর্ত্তে নরনারী-সম্বন্ধে যে একনিষ্ঠতা সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য সকল সভ্য-সমাজেই সুমহান্ অনুষ্ঠান প্রচলিত হইয়াছে, সেই একনিষ্ঠায় মঙ্গলের সহিত সৌন্দর্য্য না থাকিলে, তাহা কি কখনও মনুষ্যসমাজে আদরণীয় ও প্রশংস-নীয় হইতে পারিত? প্রবৃত্তিমুখী হইয়া দেখিলে, হয়ত উহাতে তত সৌন্দর্য্য না থাকিতে পারে; কিন্তু নিবৃত্তি ও মঙ্গলমুখী হইয়া দেখিলে, উহাতে পরম মহিমামণ্ডিত সৌন্দর্য্য বিরাজমান, দেখা যায়।

কাব্য-প্রসঙ্গে সুরুচি ও সুনীতির কথা তুলিলে, আর্টের পক্ষ হইতে উচ্চ গলায় বলা হইয়া থাকে যে, গুরুমহাশয়গিরি করা আর্টের কাজ নয়। যেন একথাটি কেহ জানে না বলিয়াই আর্টবাদীরা তাঁহাদের ঐ উক্তিটী উচ্চ গলায় ঘোষণা করেন। কিন্তু স্কুলের ছেলেরাও জানে যে, কাব্য নীতিকথা নহে। মনুষ্যের পশুভাব নষ্ট করিয়া, তাহার স্থলে দেবভাবের প্রতিষ্ঠা করা যেমন সুরুচির ও সুনীতির লক্ষ্য, সমাজের উপর সুকবির

সুকাব্যের ফলও তাহাই—কবি সেই মঙ্গল উদ্দেশ্যের কথা মনে ভাবিয়াই থাকুন, আর, না ভাবিয়াই থাকুন। কবির কাব্য-মন্দির তখনই সর্ব্বাঙ্গসুন্দর, যখন তাহার ভিত্তি সুদৃঢ় সত্যের উপরে প্রতিষ্ঠিত, অন্তঃ ও আশিখর বহির্ভাগ সুচারু কারুকার্য্যে ও হেমসৌন্দর্য্যে মণ্ডিত এবং তাহার গূঢ় অভ্যন্তরে মঙ্গল-দেবতা বিরাজিত। যাহার ফলে সমাজের অমঙ্গল, তাহা কাব্যকলাই হউক, আর চিত্রকলাই হউক, কখনই সাধনার সামগ্রী হইতে পারে না—আর্টে সুরুচি ও সুনীতির কথায় ইহাই ধ্রুব কথা।

এই মাপকাঠি ধরিয়া বিচার করিলে বাঙ্গালার অনেক উপন্যাসকেই কুৎসিতের পর্য্যায়ে ফেলিতে হয়। দুঃখের বিষয়, প্রবৃত্তিমূলক শিক্ষা-দীক্ষার গুণে ঐ সকল উপন্যাসই লক্ষ লক্ষ নরনারীর উপভোগ্য হইয়া পড়িয়াছে। একজন বিশিষ্ট সমাজহিতৈষী হিন্দুসমাজের দারুণ দুর্দ্দশা দেখিয়া যাহা বলিয়া দুঃখ প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন, আমাদের সাহিত্য সম্বন্ধেও, বিশেষত উপন্যাস-সাহিত্য সম্বন্ধেও ঠিক সেই কথাতেই দুঃখ প্রকাশ করা যাইতে পারে;—"অমানিশার ঘোর অন্ধকার। আকাশ ঘনঘটাচ্ছন্ন। শশ্মান-ক্ষেত্রের উপর দিয়া পৈশাচিক অট্টহাস্যসহকারে চপলা চমকিয়া যাইতেছে। ফেরু-পাল বিকট চীৎকার করিয়া ইতস্ততঃ ধাবিত হইতেছে। বীভৎসের সহিত ভয়ানকের মিশ্রণ হইয়াছে। গুরুদেব! কে এমন সময়ে শবসাধনে নিযুক্ত হইবে ?"

সাহিত্যের এই দুর্দ্দিনে ক্ষিতীন্দ্রনাথ নির্ভীক চিত্তে "সত্যং শিবং সুন্দরম্" মন্ত্র উচ্চারণ করিতে করিতে শবসাধনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন। এ পথে বিভীষিকা আছে, অট্টহাসির হিলি-হিলি কিলি-কিলির বিদ্রূপবাণ ও গালিবর্ষণ আছে জানিয়াও তিনি এ কার্য্যে ব্রতী হইয়াছেন। কিন্তু তাঁহার লেখনী-মুখে পুষ্প-চন্দন বর্ষণ করিবার লোকেরও অভাব হইবে না, ইহাই আমার বিশ্বাস। আর, আমি যে তাঁহার এই শুভ প্রচেষ্টার মুখে প্রথম পুষ্পটী প্রদান করিবার সুযোগ পাইয়াছি, তাহাতে আমি নিজেকে ধন্য মনে করিলাম। ইতি—

কৃষ্ণনগর
পৌষ, ১৩২৯। } শ্রীদীননাথ সান্যাল।

অনুক্রমণিকা।

আর্ট ও সাহিত্য।

ওঁতৎসৎ।

আর্ট ও সাহিত্য।

নমস্কৃতি।

ওঁ পিতা নোহসি পিতা নো বোধি।
নমস্তেহস্তু। মা মা হিংসীঃ॥
বিশ্বানি দেব সবিতর্দুরিতানি পরাসুব।
যদ্ভদ্রং তন্ন আসুব॥
নমঃ শম্ভবায় চ ময়োভবায় চ
নমঃ শঙ্করায় চ ময়স্করায় চ
নমঃ শিবায় চ শিবতরায় চ॥

তুমি আমাদের পিতা, পিতার ন্যায় জ্ঞানশিক্ষা দাও।
তোমাকে নমস্কার।
আমাকে হিংসা করিও না, আমাকে পরিত্যাগ করিও না
হে দেব! হে পিতা! পাপ সকল মার্জ্জনা কর।
যাহা ভদ্র, যাহা কল্যাণ, তাহাই আমাদের মধ্যে প্রেরণ কর।
তুমি যে সুখকর, কল্যাণকর, সুখকল্যাণের আকর,
কল্যাণ ও কল্যাণতর, তোমাকে নমস্কার॥

যজুর্বেদ।

প্রথম কথা—আর্ট ও সত্য।

ভগবান আছেন, একথা জড়বাদী পাশ্চাত্য ভূখণ্ডের অধিবাসীদিগকে এবং তাঁহাদেরই এদেশ-ওদেশবাসী শিষ্য-প্রশিষ্যবর্গকে গত মহাসমরের পরেও তর্কের দ্বারা বুঝাইবার প্রয়োজন হয়, ইহাই আশ্চর্য্য। যাহাই হউক, তাঁহাদিগকে একথা বুঝাইবার প্রয়োজন থাকিলেও আমরা সাহসপূর্ব্বক বলিতে পারি যে, সাধারণ ভারতবাসীকে তর্কযুক্তি দ্বারা সে বুঝাইবার প্রয়োজন নাই। আমরা যাঁহাদের উত্তরাধিকারী, সেই মহাপ্রাণ ঋষিরা নিজেদের সহজ জ্ঞানে ভগবানের জাগ্রত স্বপ্রকাশ সত্তা অন্তরে বাহিরে আকাশে আত্মাতে সর্ব্বত্র উপলব্ধি করিয়াছিলেন। এই ভাবে তাঁহারা ভগবানকে উপলব্ধি করিয়া বলিয়া গিয়াছেন—"যে এই তেজোময় অমৃতময় সর্বজ্ঞ পুরুষ এই অসীম আকাশে বর্ত্তমান আছেন, যে এই তেজোময় অমৃতময় সর্বজ্ঞ পুরুষ এই আত্মাতে বর্ত্তমান আছেন, তাঁহাকেই জানিয়া সাধক মৃত্যুকে অতিক্রম করেন"। তাঁহারা নিজেদের সহজজ্ঞানে ভগবানকে প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করিলেও তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ বিচারের দ্বারা জনসাধারণকে ভগবানের অস্তিত্ব বুঝাইবার চেষ্টাও করিয়াছেন। মহামতি বেদব্যাস তাঁহার বেদান্তদর্শনে বলিতে গেলে একটা সূত্রের দ্বারাই ভগবানের অস্তিত্ব দৃঢ়-

প্রমাণিত করিয়াছেন। সূত্রটার অর্থ হইতেছে "যাঁহা হইতে এই বিশ্বচরাচরের সৃষ্টি প্রভৃতি হইতেছে, তিনি নিশ্চয়ই আছেন"। তাঁহার মনের ভাব এই যে, এই বিশ্বচরাচর, এই প্রকৃতি, এই জীবাত্মা, ইহারা আপনাপনি উদ্ভূত হইতে পারে না, আপনাপনি রক্ষা পাইতে পারে না এবং আপনাপনি বিনষ্ট হইতেও পারে না;—তাহা যখন পারে না, তখন এই সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়ের এক শাশ্বত কর্ত্তা আছেনই; সমস্ত পরিবর্ত্তনের মধ্যেও তিনি ধ্রুব সনাতনরূপে, নিত্য জাগ্রত সত্তারূপে বিদ্যমান। তাই তাঁহারা সংক্ষেপে তাঁহাকে সত্যং—সত্যস্বরূপ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

সেই ঋষিদের কাল হইতে আজ পর্য্যন্ত অবিচ্ছিন্ন পরম্পরায় ভগবানের নাম ভারতে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হইতেছে বলিয়া আমরা যে তাঁহাকে বিশেষভাবে ভারতের দেবতা বলিয়া স্বীকার করি, আমাদের পক্ষে তাহা কিছু অস্বাভাবিক নহে। কিন্তু ভগবান যদি থাকেন, তবে ইহাও ধ্রুব সত্য যে তিনি বিশ্বচরাচরের, সমস্ত প্রকৃতির সর্বত্র সমভাবে আছেন। তিনি যদি সর্বত্র ও সর্বকালে সমান ভাবে না থাকিতেন, তাহা হইলে সূর্য্যচন্দ্র প্রভৃতি হইতে এই পৃথিবীর ধূলি পর্য্যন্ত চিরকাল কি সমানভাবে নিজ নিজ কার্য্য করিয়া যাইতে পারিত? কে তাহাদিগকে সমানভাবে চালাইয়া লইতে পারিত? সেই চিরন্তন মহাসত্য আছেন বলিয়াই এই সমস্ত

প্রকৃতি সুশৃঙ্খলে নিয়ন্ত্রিত হইতেছে। তাই তাঁহাকে সমস্ত জগতের দেবতা এবং সমস্ত প্রকৃতির অধিষ্ঠাত্রী দেবতা বলিয়া স্বীকার করিতে হয়।

অন্য কথায় আমরা বলিতে পারি যে, সেই দেবাধিদেব ও প্রকৃতির অধিষ্ঠাত্রী দেবতা অন্তর্ধ্যানে আপনাকে জাগ্রত করিয়া তুলিতেই প্রকৃতির অভিব্যক্তির সূত্রপাত হইল। সেই একমাত্র অদ্বিতীয় ভগবানেরই তপস্যা বা অন্তর্ধ্যানের ফলে এই প্রকৃতির অভিব্যক্তি হইয়াছে বলিয়াই আমরা প্রকৃতির সকল বিভাগেই জীবনের সকল ক্ষেত্রেই শতবিধ বৈচিত্র্যের মধ্যেও একটা একত্ব প্রকাশ হইবার চেষ্টা দেখিতে পাই। গ্রীক দার্শনিক প্লেটো এই ভাবটী আলোচনা করিয়াই বোধ হয় বলিয়াছেন যে, "প্রকৃতির কার্য্যে ভগবানেরই আর্ট বা কলাকৌশল প্রকাশ পায়"। আমরাও যাহাকে আর্ট বলি তাহাও প্রকৃতির ভিত্তিতে আমাদের প্রত্যেকের অন্তর্ধ্যানের অভিব্যক্তিরই ফল। প্রকৃতিকে ছাড়িয়া আমি এক পদও চলিতে পারি না—প্রকৃতি বা ভগবানের অন্তর্ধ্যান যাহা লইয়া বহির্বিকাশ বা আকার লাভ করিয়াছে, আমিও যে তাহারই অন্যতর কণা। সুতরাং প্রকৃতির দৃঢ়ভিত্তি বা সত্যভূমি অতিক্রম করিয়া আমার অন্তর্ধ্যান অভিব্যক্ত হইতেই পারে না।

আমি উক্ত প্রদেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছি বলিয়া এখানকার প্রকৃতির ভিত্তিতে শীতচিত্র একভাবে ধ্যান করিয়া অভিব্যক্ত

করিব ; আবার ল্যাপল্যাণ্ডবাসী তাহার নিজের জন্মস্থানের প্রকৃতির ভিত্তিতে শীতচিত্র আর একভাবে ধ্যান করিয়া অভিব্যক্ত করিবে। কিন্তু আমাদের উভয়কেই বলিতে গেলে ভগবানের চিত্তফলকের উপর, প্রকৃতির সত্য-ভূমির উপর নিজ নিজ আর্টকে বা চিত্রের কলাকৌশলকে দাঁড় করাইতে হইবে। প্রত্যেক আর্টিষ্টের বা শিল্পীর প্রকৃতিকে সত্য বলিয়া স্বীকার করিতেই হইবে। প্রকৃতিকে সত্য বলিয়া স্বীকার না করিলে আর্টিষ্টের আর্ট এক মুহূর্ত্তেরও জন্য দাঁড়াইতে পারে না। প্রকৃতিতে বর্ত্তমানে যাহা সত্য বলিয়া প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করিতেছি, ইতিহাস প্রভৃতির সাহায্যে অতীতের যাহা সত্য বলিয়া উপলব্ধি করিয়াছি, এবং কল্পনার সাহায্যে ভবিষ্যতে যাহা নিতান্ত অসম্ভব নহে বলিয়া উপলব্ধি করিতে পারি, তাহাই আমি আমার আর্টে ফলাইতে পারি।

কিন্তু যাহা অসত্য, প্রকৃতিতে যাহার অস্তিত্ব সম্পূর্ণ অসম্ভব বলিয়া আমার উপলব্ধি হইবে, তাহা আমি আমার আর্টে কিছুতেই ফলাইতে পারিব না, এবং ফলাইতে গেলেও তাহা অস্বাভাবিক বলিয়া সাধারণের চক্ষে হেয় ও পরিত্যাজ্য হইবে। আমি স্বপ্নে নিজেকে আকাশে উড়িতে দেখিয়াছি, পক্ষীদিগকে পক্ষসংযোগে সহজেই উড়িতে নিত্যই দেখিতে পাই, এবং অনেক সময়ে আমাদের প্রাণটাও আকাশের দিকে উড়িবার ভাবে দ্রুতবেগে ছুটিয়া চলিতে ব্যাকুল হইয়া উঠে। এই

কারণে, যদি কোন আর্টিষ্ট তাঁহার চিত্রে কোন মানুষকে উড়িবার রূপ দিয়া অঙ্কিত করেন, তবে তাহা অতিমাত্র কল্পনার বিষয় হইলেও নিতান্ত অসম্ভব বা অতিপ্রাকৃত—প্রকৃতির অতীত হইবে না। কিন্তু যদি কোন আর্টিষ্ট সোনার পাথরবাটী অঙ্কিত করিতে যান, তবে তাহা নিতান্তই অসম্ভব ও অতি-প্রাকৃত—প্রকৃতির অতীত হইয়া পড়িবে; অর্দ্ধেক সোনা ও অর্দ্ধেক পাথর, এই ভাবে একটা কিছু অঙ্কিত করিলেও তাহা সোনা ও পাথরের জগাখিচুড়ী হইতে পারে, কিন্তু তাহাকে সোনার পাথরবাটী বলিয়া কিছুতেই স্বীকার করা যাইতে পারিবে না। ইহা হইতে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, আর্টিষ্ট অতিপ্রাকৃত বা অস্বাভাবিক কোন কিছু অঙ্কিত করিবার চেষ্টা করিলে তাঁহাকে নিশ্চয়ই ব্যর্থকাম হইতে হইবে। তাঁহার এতটুকুও সফলতা লাভের ইচ্ছা থাকিলে তাঁহাকে প্রকৃতির সত্যভূমির উপর দাঁড়াইয়া কার্য্য করিতেই হইবে।

সত্যস্বরূপ একমাত্র ভগবান যখন প্রকৃতির অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, এবং আর্ট যখন প্রকৃতিকে অতিক্রম করিয়া দাঁড়াইতেই পারে না, তখন কাজেই স্বীকার করিতেই হয় যে, আর্টের মূল কেন্দ্র হইলেন সত্যস্বরূপ একমাত্র ভগবান এবং তাহার পত্তনভূমি হইল সত্য প্রকৃতি—সংক্ষেপে সত্য। এই যে বিশ্বচরাচরের, এই যে সমস্ত প্রকৃতির শতবিধ বৈচিত্র্যের মধ্যে একটা একত্ব উপলব্ধ হয়, যাহার অভাবে আর্ট বলিয়া কিছুই থাকিতে পারিত না—

আর্ট কতকগুলি শব্দের বা বর্ণের বা স্বরের অযথাসমাবেশেই পরিণত হইত—সেই একত্বের ভিতরেই চক্ষুষ্মান আর্টিষ্ট সমস্ত প্রকৃতির কেন্দ্র, সকল বৈচিত্র্যের একমাত্র অনন্ত উৎস ভগবানকে উপলব্ধি করিতে বাধ্য; তিনি ভগবানের সত্তাকে কখনই উপেক্ষা করিতে পারেন না। এই কেন্দ্রকে অন্তরে উজ্জ্বলরূপে উপলব্ধি করিতে পারিলেই অতীত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যতের মধ্যে এক আশ্চর্য্য যোগধারা তাঁহার নয়নগোচর হইবে এবং তখনই তাঁহার আর্ট শতমূর্ত্তিতে ফুটিয়া উঠিবে। এই কেন্দ্রে আপনাকে ডুবাইয়া দিয়া স্থির রাখিতে পারিলেই এই কেন্দ্রের পরিধি প্রকৃতিও সহজে আর্টিষ্টের আয়ত্ত হইবে, এবং সকল বিষয়েই তাঁহার আর্ট স্বাভাবিকতার ছাপ লইয়া উজ্জ্বলরূপে আত্মপ্রকাশ করিতে সক্ষম হইবে। আর্টিষ্ট সেই একত্ব ও তাহার মূল ভগবানকে ভুলিয়া কেন্দ্রচ্যুত হইয়া আত্ম-দর্পে যতই এদিক ওদিক ছুটাছুটী করিতে থাকিবেন, ততই তাঁহার বক্তব্য বিষয়সকল হইতে আর্ট লুকাইয়া পড়িবে।

শীতের সময়ে সকলেই, জীবজন্তুমাত্রেই জড়সড় হইয়া থাকে এবং সুবিধা পাইলে আগুন পোহাইতে ছাড়ে না,—ইহাই হইল সকল দেশের জন্য ভগবানের একই বিধান। কাজেই ইংলণ্ডেরই হউক আর বঙ্গদেশেরই হউক, শীতচিত্র আঁকিতে চাহিলেই আর্টিষ্টকে তাঁহার চিত্রে জড়সড় ভাব ফুটাইয়া তুলিতেই হইবে। ভগবানের কেন্দ্রভূমির উপর

দাঁড়াইয়া তাঁহার সেই একই বিধানের প্রতি ধ্যাননেত্র স্থির রাখিলে এই ভাব পরিস্ফুট করা সহজ হইবে। তাহার পর, আর্টিষ্ট যদি ইংলণ্ডের শীতচিত্র আঁকিতে চাহেন, তবে তাঁহাকে গির্জ্জা বরফপড়া এবং গৃহাভ্যন্তরে চুল্লীর নিকট বসিয়া পরিবারস্থ ব্যক্তিগণের অগ্নিসেবা প্রভৃতি আঁকিয়া চিত্রে স্বাভাবিকতা আনিতে হইবে; আবার তিনি বঙ্গদেশের শীতচিত্র আঁকিতে চাহিলে তাঁহাকে ঘরের বাহিরে ঘুঁটে পাতা প্রভৃতি জ্বালাইয়া তাহারই চারিধারে বসিয়া কঙ্কালসার দরিদ্র কুটীরবাসী পরিবারের অগ্নিসেবা প্রভৃতি আঁকিয়া আর একভাবে চিত্রে স্বাভাবিকতা ফুটাইয়া তুলিতে হইবে। এইভাবে বৈচিত্র্যের মধ্যে একত্বকে উপলব্ধি করিয়া প্রত্যেক চিত্রে যথাযথ স্বাভাবিক বৈচিত্র্য ফুটাইয়া তুলিতে পারিলেই সেই চিত্রে আর্ট প্রাণবান মূর্ত্তিতে স্বপ্রকাশ হইয়া উঠিবে। তৎপরিবর্ত্তে, বঙ্গদেশের শীতচিত্রে ইংলণ্ডের বরফপড়া প্রভৃতি আঁকিলে, অথবা ইংলণ্ডের শীতচিত্রে বঙ্গদেশের ঘুঁটেপাতা জ্বালাইবার চিত্র আঁকিলে তাহার মধ্যে কিছুতেই প্রাণের সাড়া পাওয়া যাইবে না; সে চিত্রে অস্বাভাবিকতা মূর্ত্তিমান হইয়া থাকিবার কারণে আর্টের পরিবর্ত্তে আর্টের বা কলাকৌশলের অভাবই প্রকাশ পাইবে।

এইরূপে বুঝা যাইতেছে যে, সমস্ত প্রকৃতির সকল বৈচিত্র্যের মধ্যে একত্বের যিনি উৎস, সেই ভগবানই আর্টের কেন্দ্র।

আর্ট যখন প্রকৃতিকে অতিক্রম করিয়া দাঁড়াইতে পারে না, তখন প্রকৃতির সত্যভূমিই, সংক্ষেপে সত্যই, আর্টের পত্তনভূমি এবং সেই কারণে স্বাভাবিকতাই—প্রকৃতিসিদ্ধ যাহা, অতীত বর্ত্তমান ও ভবিষ্যতের স্ব-ভাব বা কল্পনাসূত্রে যাহা সিদ্ধ হইয়াছে বা সম্ভব বলিয়া ধরা যাইতে পারে, তাহাই আর্টের প্রাণ বলিয়া স্বীকৃত হইতে পারে। ইহাও স্পষ্ট প্রকাশ পাইতেছে যে, মিথ্যার চোরা বালির উপর আর্ট দাঁড়াইতে পারে না—অস্বাভাবিকতাই আর্টের মৃত্যুর কারণ।

ইতি শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর কথিত "আর্ট ও
সাহিত্য"-কথায় আর্ট ও সত্য
বিষয়ক প্রথম কথা সমাপ্ত।

দ্বিতীয় কথা—আর্ট ও মঙ্গল

ভগবান যেমন সত্যস্বরূপ, তেমনি তিনি শিবং—মঙ্গলস্বরূপও বটে। এই সত্যও ঋষিরা আত্মজ্ঞানে উপলব্ধি করিয়া সেই মঙ্গলস্বরূপ ভগবানকে বারবার নমস্কার করিয়াছেন—"তুমি যে সুখকর কল্যাণকর, সুখকল্যাণের আকর, কল্যাণ ও কল্যাণতর, তোমাকে নমস্কার"।

তিনি মঙ্গলস্বরূপ, ইহার অর্থ কি? ইহার অর্থে আমরা এই বুঝি যে, ভগবান তাঁহার ধ্যানযোগের অভিব্যক্তিতে যে প্রকৃতির জন্মদান করিয়াছেন, সেই প্রকৃতিতে তিনি তাঁহার মঙ্গলভাব মুদ্রিত করিয়া দিয়াছেন। সমস্ত প্রকৃতির সকল অংশের কথা জানিবার অধিকার আমরা প্রাপ্ত হই নাই; কিন্তু প্রকৃতির এক অংশ এই পৃথিবী স্বীয় বাষ্পময় কোষ ভেদ করিয়া এই যে শ্যামল ও শোভন রূপ ধারণ করিয়াছে এবং এই পৃথিবীতে প্রাণের অভিব্যক্তিতে ক্ষুদ্রতম কীটপতঙ্গ অবধি ভগবদ্ভক্ত মানব পর্য্যন্ত যে জন্মগ্রহণ করিয়াছে ও করিতেছে, ইহাতেই তো তাঁহার সেই মঙ্গলভাবের প্রত্যক্ষ পরিচয় আমাদের সম্মুখে নিত্যই প্রাপ্ত হইতেছি। ভগবান কেবল দর্শকের মত দাঁড়াইয়া নাই। জগতের প্রতি পরমাণুতে, কালের প্রতি মুহূর্ত্তে তিনি স্বীয় মঙ্গলভাব নিহিত রাখিয়াছেন। যে দিকে দৃষ্টিপাত করি, সেই দিকেই তাঁহার

মঙ্গলভাব বিস্তৃত দেখি। এক ধ্রুবতারাকে আকাশে রাখিয়া দিয়া জ্যোতির্বিদ্যা, নৌবিদ্যা প্রভৃতির কত-না উন্নতিসাধনের ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন; কোথায় হিমালয় আর কোথায় এই বঙ্গদেশ—শত শত নদী হিমালয় হইতে নিঃসৃত হইয়া সমগ্র দেশকে শস্যশ্যামল করিয়া তুলিতেছে!

জগতের উন্নতির অভিমুখে ছুটিয়া চলিবার চেষ্টাই হইল মঙ্গলভাবের বহির্বিকাশ। এই বিষয়ে একটু গভীরভাবে আলোচনা করিলেই আমরা দেখিতে পাইব যে, প্রত্যেক মানবের, প্রত্যেক জীবজন্তুর, সমস্ত প্রকৃতির অন্তরের কথা হইতেছে—নিজের নিজের এবং সেই সঙ্গে আত্মীয়স্বজন ও প্রতিবেশীর, এবং সেই সঙ্গে সমস্ত জগতের, নিরবচ্ছিন্ন সুখের, অপর কথায় মঙ্গলের সুপ্রতিষ্ঠা করা। ভগবান যে মঙ্গলভাব আমাদের অন্তরে নিহিত করিয়া দিয়াছেন, তাহারই অবলম্বনে ঐ কল্যাণকর অন্তর্ভাবের বহির্বিকাশেই প্রকৃতির নিম্নতম স্তর অবধি উচ্চতম স্তর পর্য্যন্ত সকল স্তরেই উন্নতিসাধনের একটা চেষ্টা দেখা যায়। শত সহস্র উত্থানপতনের ভিতর দিয়াও এই উন্নতির চেষ্টা পরিস্ফুট হইতে দৃষ্ট হয়। সংক্ষেপে বলিতে গেলে আমরা নিঃসংশয়ে বলিতে পারি যে, ভগবানের এবং সুতরাং তাঁহা হইতে নিঃসৃত প্রকৃতির প্রকৃত লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য জগতে মঙ্গলভাবের প্রসার এবং তাহারই ফলে জগতের উন্নতিসাধন।

আমরা ইতিপূর্ব্বেই দেখিয়া আসিয়াছি যে, ভগবান যেমন প্রকৃতির কেন্দ্র, তেমনি তিনি আর্টেরও কেন্দ্র, এবং প্রকৃতিই হইল আর্টের পত্তনভূমি। এখন দেখিতেছি যে, ভগবান প্রকৃতিতে তাঁহার মঙ্গলভাব মুদ্রিত করিয়া রাখিয়াছেন এবং জগতের উন্নতিসাধনই সেই মঙ্গলভাবের বহির্বিকাশ। সুতরাং আমরা নির্ভয়ে বলিতে পারি যে, আর্টেরও প্রকৃত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য, অন্তত প্রকৃত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হওয়া উচিত,—জগতে মঙ্গলভাব বিস্তার করা এবং তাহারই পরিণামে জগতের উন্নতিসাধন। আর্ট যখন প্রকৃতিকে অতিক্রম করিয়া দাঁড়াইতেই পারে না, এবং জগতের উন্নতিসাধনই যখন প্রকৃতির প্রকৃত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য, তখন চিত্রসম্বন্ধীয় বল, সঙ্গীতসম্বন্ধীয় বল, আর সাহিত্যসম্বন্ধীয় বল, সকল বিষয়ক আর্টেরই যে মূল লক্ষ্য হওয়া উচিত জগতের উন্নতিসাধন, সে বিষয়ে কোন সন্দেহই আসিতে পারে না।

এই উন্নতিসাধনের সর্ব্বপ্রধান ও সর্ব্বোৎকৃষ্ট উপায় হইতেছে জগতে মঙ্গলভাবের বিস্তার, জগতের অন্তরে স্বাস্থ্যসাধন। তাই প্রকারান্তরে বলিতে পারি যে, জগতের স্বাস্থ্যসাধনই আর্টের মূল উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। এই উদ্দেশ্য সাধনের উপায় অবশ্য বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন হইবেই—ব্যায়ামক্ষেত্রে একপ্রকার, সাহিত্যক্ষেত্রে একপ্রকার, বিজ্ঞানক্ষেত্রে একপ্রকার। কিন্তু ব্যায়ামক্ষেত্রে কেবলই ব্যায়াম

করিবার ফলে দুই একজন হোঁৎকা মাংসপিণ্ডাকৃতি কুস্তিগীর প্রস্তুত হইলেও তাহাতে প্রকৃত কলাকৌশল প্রয়োগের ফল প্রকাশ পায় বলিয়া ধরিব কিনা সন্দেহ। যে সকল ব্যায়ামের ফলে ব্যায়ামকারীদের শরীরে স্বাস্থ্যবিধান হয়, তাহারই মধ্যে ব্যায়ামের প্রকৃত আর্ট বা কলাকৌশল প্রকাশ পায় বলিয়া মনে করি। শরীরের স্বাস্থ্যবিধান বজায় রাখিয়া যে ব্যায়ামে যত technique বা প্রয়োগবিজ্ঞান প্রকাশ পাইবে, সেই ব্যায়াম তত প্রশংসনীয় হইবে। কোন ব্যায়ামের ফলই যদি শারীরিক স্বাস্থ্যহানি হয়, তবে তাহার technique বা প্রয়োগবিজ্ঞান যতই কেন ভাল হউক না, তাহা আমাদের নিকট প্রশংসা পাওয়া দূরে থাক, ব্যায়াম বলিয়াই পরিগণিত হয় না। সেইরূপ সঙ্গীত বল, চিত্র বল, সকল বিষয়েই কেবল কসরৎ দেখাইয়া আর্টপ্রকাশের চেষ্টা করিলে ব্যর্থকাম হইতে হইবে। বিভিন্ন বিষয়ে আর্টপ্রকাশের উপায় বিভিন্ন হইলেও সকলেরই সাধারণ মূল তত্ত্ব ভুলিলে চলিবে না, যে, আর্ট সংসিদ্ধ করিতে চাহিলে তাহা দ্বারা জগতের স্বাস্থ্যসাধন, জগতের কল্যাণ ও উন্নতিসাধন কতটা হইল, তাহার দিকে আমাদের লক্ষ্য রাখিতে হইবে।

জগতের মঙ্গল ও উন্নতিসাধনই আর্টের প্রকৃত উদ্দেশ্য হইলেও অমঙ্গলজনক কার্য্যে, অন্তত মঙ্গলের অভাবজনক কার্য্যেও যে আর্টের প্রয়োগ হইতে পারে না, আমি তাহা

মনে করি না। সুস্থ মনুষ্যের ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্য ভদ্রভাবে আহার করাকেও আহার বলা যায়, পেটুকের অকারণে আহার করাকেও আহার বলা যায়, আবার আঁস্তাকুড় হইতে পাগল মানুষ যখন দু'চারিটি পড়া-ভাত খুঁটিয়া খুঁটিয়া খায়, তাহাকেও আহার বলা যায়। কিন্তু প্রকৃত আহার অর্থে আমরা প্রথমোক্ত আহারকেই ধরি, শেষোক্ত দুইটীকে প্রকৃত আহার বলিয়া ধরি না। সেইরূপ জগতে কল্যাণকর ও অকল্যাণকর উভয়বিধ কার্য্যেই আর্টের প্রয়োগ সম্ভব হইলেও প্রকৃত আর্টের অর্থে আমরা সেই আর্টই বুঝি, যাহা মানুষকে মঙ্গলের পথে, উন্নতির মুখে লইয়া চলে, কল্পনাকে অনন্তের পথে, মুক্ত উদারভাবের দিকে লইয়া চলে এবং জগতের উন্নতিকল্পে সহায়তা করে। বাতাস আমাদের জীবনধারণের একটী প্রধান উপকরণ বটে। কিন্তু সে কোন্ বাতাস?—প্রভাতের সুনির্ম্মল বায়ু, মুক্ত স্থানের জীবনী শক্তিপূর্ণ বায়ুই সেই বাতাস। যে বায়ুতে অক্সিজেন জীবনধারণের উপযুক্ত যথাযথ পরিমাণে থাকিবে, তাহাই প্রকৃত বায়ুনামে অভিহিত হইতে পারিবে। তাই বলিয়া যে বায়ুতে অক্সিজেন খুবই কম ও দুর্গন্ধ পরিপূর্ণ, তাহাকেও যে বায়ু বলিব না তাহা নহে। কিন্তু এই দুর্গন্ধ বায়ুতে দীর্ঘকাল অবস্থিতির ফল হইল যক্ষ্মা-রোগ এবং অক্সিজেনে ভরা মুক্ত বায়ুতে অবস্থিতির ফল হইল দীর্ঘায়ু লাভ। সেইরূপ যে আর্টের ফলে আমাদের আত্মা

জীবন লাভ করিতে পারে, তাহাকেই আমরা প্রকৃত আর্ট বলিব। বিদ্রূপাত্মক ভেংচিকাটা আর্ট অথবা শ্লীলতার বা স্বাভাবিকতার মূলচ্ছেদক আর্টকেও যে পারিভাষিকভাবে আর্ট বলিবার অধিকার থাকিবে না, এমন কোন কথা নাই। কিন্তু সেই আর্ট মানুষকে নীচের দিকে অধোগতির পথে লইয়া যায় বলিয়া তাহাকে প্রকৃত আর্ট বলা যায় না।

জগতের মঙ্গল ও উন্নতিসাধন যদি আর্টের প্রকৃত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হয়—কেবল ইহাই কেন, জগতের কল্যাণকর অথবা অকল্যাণকর বিষয়ে আর্টের প্রয়োগ সম্ভব কি না, ইহা যদি বিচারের বিষয়ও হয়, তাহা হইলেও আর্টকে জগতের সকল বিষয় হইতে অসংযুক্ত বা পৃথকভাবে দেখা চলিতেই পারে না। আর্ট একা একা দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিলে জগতের মঙ্গলা-মঙ্গল লইয়া তাহার সম্বন্ধের কোন কথাই উঠিতে পারিত না। আর্ট একা একা দাঁড়াইতে পারে না বলিয়াই কোন বিষয়ে আর্টকে সুপ্রযুক্ত করিতে ইচ্ছা করিলে perspective বা পরিপ্রেক্ষণের ভিত্তিতে সেই বিষয়টীকে ফলাইয়া তুলিতে হয়। পরিপ্রেক্ষণের অর্থ আর কিছুই নহে—পরিবেশের বা পরিপার্শ্বের সহিত নির্ব্বাচিত বিষয়টী যে ভাবে দৃষ্ট হয় তাহাই পরিপ্রেক্ষণের ভাবার্থ। কাজেই দেখিতেছি যে, যে দিক দিয়াই হউক, আর্টকে পরিপার্শ্বের সহিত সম্পূর্ণ পৃথক করিয়া দেখিতে পারি না—দেখিলে আর্টের আর্টত্বই থাকে না। আর, যদি

আর্টকে পরিপার্শ্বের সহিত সংযুক্তভাবে দেখিতেই হয়, তবে আর্টের উপর জগতের মঙ্গলামঙ্গলের জন্য দায়িত্বের কথাও স্বতই আসিয়া পড়ে। ইহা হইতে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, কোন প্রকৃত আর্টিষ্ট আর্টের দোহাই দিয়া স্বীয় স্কন্ধ হইতে তাঁহার আর্টের সহিত জগতের শুভাশুভের দায়িত্বসম্বন্ধ ঝাড়িয়া ফেলিতে পারেন না।

ইতি শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর কথিত "আর্ট ও
সাহিত্য"-কথায় আর্ট ও মঙ্গল
বিষয়ক দ্বিতীয় কথা সমাপ্ত।

ওঁ

তৃতীয় কথা—আর্ট ও সৌন্দর্য্য।

ভগবানের সত্যস্বরূপ ও মঙ্গলভাব মাত্রই আর্টের কেন্দ্র নহে; তাঁহার "সত্যং শিবং সুন্দরং" সত্য-শিব-সুন্দর মূর্ত্তিই আর্টের কেন্দ্র। এইখানে একটা প্রশ্ন উঠে এই যে, আর্ট কি? আর্ট কি, তাহা সংজ্ঞা দ্বারা, পরিভাষা দ্বারা ঠিক করিয়া বুঝানো বড়ই কঠিন—বোধ হয় অসম্ভব। মিষ্ট আস্বাদ কি, সুগন্ধ কি, এ সমস্তও যেমন সংজ্ঞা দ্বারা বর্ণনা করা অসম্ভব, তেমনি পরিভাষা দ্বারাও আর্ট বুঝানো যাইতে পারে বলিয়া মনে হয় না। বলিতে কি, কোন মূল তত্ত্বই, অনুভূতির কোন বিষয়ই সত্য-সত্য পরিভাষা দ্বারা নির্দ্দিষ্ট করা যাইতে পারে কি না সন্দেহ। পারিপার্শ্বিক অবস্থা বর্ণন করিয়া আলোচ্য তত্ত্বের যথার্থ প্রকৃতিটা কোনরূপে বুঝাইতে পারিলেই যথেষ্ট বলিয়া মনে করি, কারণ তাহা দ্বারাই আমাদের প্রয়োজন সিদ্ধ হইতে পারে। ভগবদ্গীতাতেও এই প্রথাই অবলম্বিত হইয়াছে দেখি। অর্জ্জুন যখন শ্রীকৃষ্ণকে স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণ জিজ্ঞাসা করিলেন, তখন শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে পরিভাষা দ্বারা স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণ না বলিয়া যে সকল অবস্থা হইলে লোককে স্থিতপ্রজ্ঞ বলা যাইতে পারে, সেই সকল পারিপার্শ্বিক অবস্থার বর্ণনা করিয়া স্থিতপ্রজ্ঞ কাহাকে বলে তাহা বুঝাইয়া দিলেন। আমরাও সেইরূপ আর্টকে কেবল পারিপার্শ্বিক অবস্থার ভিতর দিয়াই বুঝিবার ও বুঝাইবার চেষ্টা করিতে পারি।

আর্ট বলিতে সাধারণতঃ আমরা যাহা বুঝি, তাহা আমাদের মনের একটী অবস্থা ব্যতীত আর কিছু বলিয়া আমাদের মনে হয় না। জার্ম্মান দার্শনিক ষেলিং (Schelling) বোধ হয় ঠিকই বলিয়াছেন যে, আর্টের বস্তুর মধ্যে আমরা সসীমের মধ্যে অসীমকে প্রাপ্ত হই; আমাদের অজানতই অসীমকে উপলব্ধি করানো হইল আর্টের প্রকৃতি। আমরাও দেখিয়া আসিয়াছি যে, সত্যস্বরূপ মঙ্গলস্বরূপ ভগবানই আর্টের কেন্দ্র; তাঁহার অন্তর্ধ্যানের অভিব্যক্তি এই সত্য-প্রকৃতিই তাহার পত্তনভূমি; তাহার মূল প্রাণ স্বাভাবিকতা, এবং তাহার মূল লক্ষ্য জগতের স্বাস্থ্য ও উন্নতিবিধান। কাজেই সসীমের মধ্যে অসীমকে উপলব্ধি করাইতে না পারিলে আর্টের প্রকৃত আর্টত্ব থাকে কিনা সন্দেহ।

কিন্তু আর্টের আর একটু বিশেষত্ব আছে। সসীমের মধ্যে অসীমকে উপলব্ধি করিবার পথে, সত্যমঙ্গল ভগবানকে উপলব্ধি করিবার পথে, এবং জগতের স্বাস্থ্য ও উন্নতিসাধনের পথে আর্ট আমাদিগকে সৌন্দর্য্য উপভোগের ভিতর দিয়া লইয়া যায়। বিজ্ঞান বল, দর্শন বল, তাহাদেরও কেন্দ্র সত্যমঙ্গল ভগবান, তাহাদেরও পত্তনভূমি প্রকৃতি, তাহাদেরও প্রাণ স্বাভাবিকতা, এবং তাহাদেরও লক্ষ্য জগতের স্বাস্থ্য ও উন্নতিসাধন। কিন্তু বিজ্ঞান আমাদিগকে আর্ট হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন প্রণালীর ভিতর দিয়া সেই পথে লইয়া যায়; দর্শন

আবার আমাদিগকে আর এক পথে সেইদিকে লইয়া চলে। কিন্তু সুনীতির কেন্দ্র যেমন সত্যমঙ্গল ভগবানের "শুদ্ধ অপাপবিদ্ধ" মূর্ত্তি, ধর্ম্মের কেন্দ্র যেমন সত্যমঙ্গল ভগবানের "ধর্ম্মাবহ্ পাপনুদ" মূর্ত্তি, তেমনি আর্টের কেন্দ্র হইল সেই একই সত্যমঙ্গল ভগবানের "সত্য-শিব-সুন্দর" মূর্ত্তি। তাই আর্টের বহিরঙ্গ হইল সৌন্দর্য্য। তাহার সমস্ত technique বা প্রয়োগবিজ্ঞানই এই সৌন্দর্য্য ফুটাইয়া তুলিবার জন্য প্রযুক্ত হয়। সৌন্দর্য্যই হইল আর্টের দেহ। যে কোন বিষয় আমরা আর্টের দ্বারা ব্যক্ত করিতে যাইব, সেই বিষয় হইতেই আর্ট সৌন্দর্য্য খুঁজিয়া বাহির করিয়া স্বীয় অঙ্গসৌষ্ঠব পরিপুষ্ট করিতে অগ্রসর হয়। এই কারণে অনেক সময়ে আমরা সৌন্দর্য্যমাত্রকেই আর্টভ্রমে গ্রহণ করিয়া ভ্রমে পতিত হই। প্রকৃত আর্টের মধ্যে তাহার অন্তরঙ্গ জগতের স্বাস্থ্য ও উন্নতিবিধানের মন্ত্র এবং তাহার বহিরঙ্গ সৌন্দর্য্য, এই উভয়ের সামঞ্জস্যমত সমাবেশ থাকা চাই।

কেবল অণুবীক্ষণের পরীক্ষার জন্য একটা গাছের পাতা রশ্মিলিখিত (photographed) করিলেই তাহা আর্টের জিনিষ বলিয়া স্বীকৃত হইবে না সত্য, কিন্তু একটী সুন্দর দৃশ্য রশ্মিলিখিত হইলে তাহাকে আমরা আর্টের বস্তু বলিয়া সযত্নে রক্ষা করিতে নিশ্চয়ই দ্বিধা বোধ করিব না। সেইপ্রকার চিত্রে যদি কেবল একরাশ ধুলোকাদা আঁকিয়া তাহা সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মভাবে প্রত্যক্ষ করাই, জানি না, সকল আর্টসমালোচকের

সহিত আমরা এ বিষয়ে একমত হইতে পারিব কি না, কিন্তু আমাদের মতে তাহা নিশ্চয়ই আর্ট বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না। সেই ধূলোকাদারও চিত্রে যতটা সৌন্দর্য্য ফুটাইয়া তুলিয়া আমাদের নিজের এবং সেই সঙ্গে অপরেরও বুদ্ধিবৃত্তি ও কল্পনার উন্নতিবিধানে সক্ষম হইব, এবং কাজেই জগতেরও বুদ্ধিবৃত্তি ও কল্পনার উন্নতিবিধানে সহায়তা করিতে পারিব, ততই তাহা আর্ট নামের উপযুক্ত হইবে। যদি কোন যন্ত্রের সাহায্যে একেবারে হুবহু ওস্তাদদিগের মুদ্রাদোষ ও মুখভঙ্গীসহ গানের ছাপ তুলিয়া চক্ষের সম্মুখে ধরিতে পারি, তবে তাহাকে আর্ট বলিয়া পরিগণিত করা হইবে কি না সন্দেহ। কিন্তু সেই সমস্ত মুদ্রাদোষ বাদ দিয়া ওস্তাদের গানের মধ্যে যতই মাধুরী ফুটাইয়া জগতের স্বাস্থ্যসাধনে সহায়তা করিতে পারিব, ততই তাহাকে যে আর্ট বলিয়া ধরা হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

যে কোন বিষয়কে সৌন্দর্য্যের ভিতর দিয়া দেখাইবার অন্যতর প্রধান উপায় হইতেছে তাহাকে perspective বা পরিপ্রেক্ষণের ভিত্তিতে অর্থাৎ দূর ও নিকটবর্ত্তী পরিপার্শ্বের বা পরিবেশের সহিত সম্বন্ধসূত্রে অঙ্কিত করা। আর্টের সহিত মঙ্গলের সম্বন্ধ বিচার করিবার সময় দেখিয়া আসিয়াছি যে, আর্টকে তাহার প্রকৃত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য জগতের স্বাস্থ্য ও উন্নতিসাধনের পথে পরিচালিত করিতে চাহিলে তাহাকে

পরিপ্রেক্ষণের ভিত্তিতে দাঁড় করাইতেই হইবে। সেইরূপ আর্টের সহিত সৌন্দর্য্যের সম্বন্ধও আলোচনা করিলে স্পষ্টই উপলব্ধ হইবে যে, আর্টকে পরিপ্রেক্ষণের ভিত্তিতেই দাঁড় করাইতে হইবে। সুন্দর বা অসুন্দর, পরস্পরের তুলনাতেই উপলব্ধ হয়। আমাদের সীমাবদ্ধ অনুভূতিতে আমরা পূর্ণ-সুন্দরের পূর্ণ সৌন্দর্য্য উপলব্ধি করিতে পারি না। কাজেই আমাদিগকে অসুন্দরের তুলনায় সুন্দরকে .উপলব্ধি করিতে হয়। আমাদের নিকটবর্ত্তী স্থানে আমরা যাহা কিছু দেখি, তাহার মধ্যে গুণের সঙ্গে দোষও যাহা থাকে, সে সমস্তই আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়। কিন্তু দূরবর্ত্তী স্থানে যাহা দেখি, তাহাতে দোষ যাহা থাকে তাহা আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় না, তাই পরিপ্রেক্ষণের ভিত্তিতে দাঁড়াইয়া যতই দূরবর্ত্তী দৃশ্যের চিত্র অঙ্কিত করা যায়, ততই তাহা সুন্দর হয়, ততই তাহা সাধারণতঃ আমাদের প্রাণস্পর্শী হয়। তাহার কারণ এই যে, নিকটের ধূলোকাদা অন্তরালে থাকিয়া যায়, এবং সুন্দর দৃশ্যের সৌন্দর্য্যটুকুই .আমাদের চক্ষের সমক্ষে ফুটিয়া উঠে। নিকটবর্ত্তী দৃশ্যের চিত্রের মধ্যেও যে আর্ট বা কলামাধুরী প্রকাশ পাইতে পারে না তাহা নহে; কিন্তু তাহাকেও প্রাণস্পর্শী চিত্ররূপে দাঁড় করাইতে চাহিলে পরিপ্রেক্ষণের ভিত্তিতে পরিপার্শ্বের সহিত যোগসম্বন্ধে তাহার মধ্য হইতেও সৌন্দর্য্য বাহির করিয়া ফুটাইয়া তুলিতে হইবে—অসুন্দর বস্তু-

সকল যথাসম্ভব অন্তরালে সরাইয়া রাখিতে হইবে। আর্টের ভিত্তি যেমন সত্য, আর্টের অন্তরঙ্গ যেমন মঙ্গল, আর্টের বহিরঙ্গ তেমনি সৌন্দর্য্য। যে আর্টে এই তিনটী বিষয়ের একত্র সমাবেশ হইবে, সেই আর্টই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আর্ট বলিয়া আমাদের অন্তরে সহজেই উপলব্ধ হইবে নিঃসন্দেহ।

ইতি শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর কথিত "আর্ট ও
সাহিত্য" কথায় আর্ট ও সৌন্দর্য্য
বিষয়ক তৃতীয় কথা সমাপ্ত।

চতুর্থ কথা—আর্ট ও সাহিত্য।

সাহিত্যজগতের সকল বিভাগেই আর্টপ্রকাশের অবসর আছে—বিষয়গুলি ব্যক্ত করিবার প্রণালীর উপরেই, পরিপার্শ্বের সহিত পরিপ্রেক্ষণের ভিত্তিতে বিষয়গুলি যথাযথরূপে ফলাইবার উপরেই আর্ট ব্যক্ত হওয়া না-হওয়া নির্ভর করে। এমন কি, যে বিজ্ঞান হাতে-হেতেড়ে পরীক্ষার উপরেই প্রধানত দাঁড়াইয়া আছে, সেই বিজ্ঞানবিভাগেও আর্ট প্রকাশের অবসর আছে দেখা যায়। কিন্তু উপন্যাস, নাট্য ও কাব্যবিভাগেই আর্ট প্রকাশের অবসর কিছু বেশী ও সহজে পাওয়া যায়। আমাদের দেশে নাট্য ও কাব্য বহু পূর্ব্বাবধিই বহুলপ্রচলিত ছিল। উপন্যাস নামক পদার্থের যে নিতান্তই অভাব ছিল তাহা বলিতে পারি না। কিন্তু উপন্যাসের আধুনিক আদর্শ ধরিলে সেগুলি উপন্যাস নাম পাইবার অধিকারী হইবে কি না জানি না। সেকালের উপন্যাসের সর্ব্বপ্রধান আদর্শ কাদম্বরী।

বিজ্ঞান ও দর্শন লিখিতে গেলে যেরূপ প্রমাণ ও নিয়মাবলীর মধ্যে আপনাকে বাঁধিয়া ফেলিতে হয়, নাট্য ও কাব্যে ততটা বাঁধাবাঁধির মধ্যে যাইয়া পড়িতে হয় না। তাই কি এদেশে, কি অন্যদেশে সর্ব্বত্রই বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক অপেক্ষা নাটককার ও কবির সংখ্যা অনেক বেশী দেখা যায়। একেই তো এদেশে নাট্য ও কাব্যের, বিশেষত কাব্যের, যথেষ্ট প্রচলন

ছিল, তাহার উপর আবার এদেশে ইংরাজী শিক্ষার বহুল প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে পাশ্চাত্য দেশের নাট্য ও কাব্য লিখিবার নবতর ভাব ও নবতর ভঙ্গী আমদানি হওয়ায় এদেশবাসীর কাব্য ও নাট্যরচনার পরিসর খুবই বাড়িয়া গেল। ইংরাজী শিক্ষার সঙ্গে পাশ্চাত্য সাহিত্যের আর একটী অঙ্গ এদেশে চিরস্থায়ী আতিথ্য গ্রহণ করিল—সেটী উপন্যাস। আমি ইতিপূর্ব্বেই বলিয়া আসিলাম যে, আধুনিক উপন্যাসের অনুরূপ কোন কিছু ইংরাজী শিক্ষা প্রচলনের পূর্ব্বে এদেশে প্রচলিত ছিল না। অথচ এদেশের ইংরাজীশিক্ষিতগণ দেখিলেন যে, নাট্য ও কাব্যরচনায় যেটুকু বাঁধাবাঁধি নিয়মে পড়িতে হয়, উপন্যাসরচনায় সেটুকুও বাঁধাবাঁধিতে পড়িতে হয় না। এই স্বাধীনতা থাকিবার কারণেই যেমন কবিতায় অমিত্রাক্ষর ছন্দ সহজেই প্রসিদ্ধি লাভ করিল, তেমনি এই স্বাধীনতার কারণেই উপন্যাস ও তাহার বিভিন্ন উপবিভাগের রচনায় অধিকাংশ শিক্ষিত ব্যক্তি হাত "মক্স" করিতে লাগিলেন। কাজেই বর্ত্তমানকালে এদেশে নাট্য, কাব্য ও উপন্যাস, সাহিত্যের এই তিনটী বিভাগ, বিশেষত উপন্যাসবিভাগ, পাশ্চাত্য সাহিত্যের অনুসরণে বহুল বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে ও করিতেছে।

আমাদের দেশের অধিকাংশ সাহিত্যিক যখন সাহিত্যের এই তিনটী বিভাগেরই দিকে বেশী ঝুঁকিয়া পড়িলেন, তখন

বলা বাহুল্য যে, এই তিন বিভাগেই তাঁহাদের আর্ট ফলাইবার চেষ্টাও সমধিক দৃষ্ট হইবে। কিন্তু এই তিনটী বিভাগের মধ্যে কবিতায়, অল্প পরিসরের মধ্যে অনেকটা ভাব সংহতভাবে প্রকাশ করিতে হয় বলিয়া কাব্যে আর্টের মাধুরী প্রকাশ করিতে বিশেষ একটু ক্ষমতা ও নৈপুণ্যের প্রয়োজন। তাই অপেক্ষাকৃত অল্প লোকে কাব্যরচনায় হস্তক্ষেপ করেন, এবং করিলেও কাব্যে আর্ট ভালরূপ ফলাইতে আরও অল্প লোক সফলকাম হন। কাব্য অপেক্ষা আবার নাট্যরচনায় আরও অল্পসংখ্যক লোককে অগ্রসর হইতে দেখা যায়। সমাজ বিশেষ একটু সমুন্নত অবস্থায় না পৌঁছিলে নাটকরচনা সম্ভবপর বলিয়া মনে হয় না। কাব্য যেমন কেবল কল্পনায় আলোচিত হইবার জন্য রচিত হয়, এবং কল্পনাতেই আলোচিতও হয়, নাটক সেরূপ হইতে পারে না। নাটক অভিনয়ের জন্যই রচিত হয়। কোন নাটক প্রত্যক্ষভাবে রঙ্গমঞ্চে অভিনীত দেখিবার অবসর না পাইলেও তাহা পাঠ করিবার কালে আমরা তাহার অভিনয়, অন্তত কল্পনাতেও দেখিয়া লইতে বাধ্য হই। এই অভিনয় প্রত্যক্ষভাবে রঙ্গমঞ্চে দেখিবার সময়েই হউক, অথবা মানসপটে কল্পনার চক্ষে দেখিবার সময়েই হউক, কোন্ নাটকে আর্ট ও তাহার technique বা প্রয়োগবিজ্ঞান কতদূর সাফল্য লাভ করিয়াছে, তাহা বড়ই স্পষ্টরূপে ফুটিয়া উঠে। কতটা সত্য ঘটনার উপর দাঁড়াইয়া

এবং কতটা সৌন্দর্য্যের ভিতর দিয়া কতটা মঙ্গলভাব জগতে বিতরিত হইল, একটা নাটকে সমস্তটা যেন সহসা চক্ষের উপর আসিয়া চাপিয়া পড়ে। আর্ট সর্ব্বাঙ্গীন মূর্ত্তিতে নাটকে যেন প্রত্যক্ষভাবে বাহির হইয়া পড়িতে চাহে। ইহা ব্যতীত, কাব্যের ন্যায় নাটকেও অপেক্ষাকৃত স্বল্প পরিসরের মধ্যে কলা-কৌশল প্রয়োগ করিয়া বাহাদুরী লইতে হয়। এই প্রকার প্রত্যক্ষমূলক সমালোচনার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া অল্পক্ষেত্রে সুনিপুণভাবে কলাকৌশল প্রয়োগ করিয়া বাহাদুরী লওয়া বড় সহজ কথা নহে বলিয়া খুবই অল্পসংখ্যক লোক নাটক রচনায় অগ্রসর হন।

নাটক ও কাব্য অপেক্ষা উপন্যাসে আর্ট প্রয়োগের অবসরও যেমন অনেক বিস্তৃত, তেমনি স্বাধীনতাও যথেষ্ট। আমরা ইতিপূর্ব্বেই বলিয়া আসিয়াছি যে, আজ পর্য্যন্ত উপন্যাসকে সংহত আকার দিবার কোন বাঁধাবাঁধি নিয়ম প্রচারিত হয় নাই। এই কারণে উপন্যাসলেখকেরা তাঁহাদের উপন্যাসে একটু হাত-পা ছড়াইয়া প্রয়োজনমত আর্টের খেলা খেলিবার অবসর পান। স্বাধীনতার সারমাটিতে আর্টরূপ গোলাপ-কুসুম ফুটাইবার বড়ই সুবিধা হয়। ঔপন্যাসিকদিগের মধ্যে যাঁহারা প্রকৃত আর্টিষ্ট, তাঁহারা নিজেদের গ্রন্থে এই স্বাধীনতার সদ্ব্যবহার করিয়া সত্য-মঙ্গল-সৌন্দর্য্যমূলক আর্টকে ফুটাইয়া তুলিতে সফলকাম হন। কিন্তু অনেক উপন্যাসলেখক

স্বাধীনতাভ্রমে উচ্ছৃঙ্খলতা ও স্বাধীনতার অপভ্রংশকে নিজেদের গ্রন্থে প্রবেশ করাইয়া ভ্রান্ত সংস্কারের ফলে মনে করেন যে, গ্রন্থে এক আশ্চর্য্য কলাকৌশল প্রয়োগ করা হইয়াছে! যাই হোক, উপন্যাসে স্বাধীন ভাবে নিজের ইচ্ছামত অনেক বিষয় লেখা যায়, অনেক স্বাধীন মতামত প্রকাশ করা যায়, কাজেই আর্ট ফুটাইয়া তুলিবার অনেক অবসর পাওয়া যায়, এবং তাহাতে কথার মিল, ছন্দের মিল প্রভৃতি কোনই বাঁধাবাঁধির প্রয়োজন হয় না; এই সকল কারণে সাধারণত আজকাল যাঁহারাই সাহিত্যচর্চ্চা করেন, তাঁহাদের অনেকেরই উপন্যাস লিখিবার দিকেই ঝোঁক পড়ে।

এই কারণেই আমাদের বিশ্বাস, পাশ্চত্য দেশের ন্যায় এদেশও উপন্যাসে উপন্যাসে ছাইয়া গিয়াছে। এই প্রকারে দেশ উপন্যাসে ছাইয়া যাইবার একটী বিষময় পরিণাম ঘটিয়াছে এই যে একটু লিখিতে পড়িতে শিখিয়াই বালক যুবক বৃদ্ধ সকলেই উপন্যাস পড়িবার দিকে এবং উপন্যাস-নামধেয় যাহা হোক একটা কিছু লিখিবার দিকেই ঝুঁকিয়া পড়ে। যে সকল বিষয়ের আলোচনায় এতটুকুও কঠোর চিন্তা আবশ্যক, বিজ্ঞান প্রভৃতি যে সকল বিষয় আলোচনা করিলে অল্পের মধ্যে অনেকটা জ্ঞান লাভ হইতে পারে; এমন কি, আর্ট সম্বন্ধীয় কোন কিছু, অথবা কোন উপন্যাসও পড়িতে যদি আমাদিগকে একটু বিশেষ ভাবে মাথা ঘামাইতে

হয়, তাহা হইলে সে সকল বিষয়ের কোন গ্রন্থই আমরা পড়িতেও চাহি না, লিখিতেও চাহি না। কারণ জিজ্ঞাসা করিলে শোনা যায় যে, সমস্ত দিনের হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রমের পর গৃহে আসিয়া ঐ সমস্ত কঠিন ও কঠোর বিষয় আলোচনা করিতে ভাল লাগে না। বলা বাহুল্য, আমাদের দেশে বর্ত্তমানে যাঁহারাই কিছু লেখাপড়া শিক্ষা করেন, তাঁহারাই প্রায় চাকরীতেই ঢুকিয়া যান, অথবা চাকরীর জন্য লালায়িত হইয়া আশায় আশায় দিবারাত্রি ছুটাছুটী করিয়া ক্লান্ত হইয়া পড়েন। বাস্তবিকই, চাকরীর হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রমের, অথবা চাকরীর আশায় ছুটাছুটীর শ্রান্তি ও ক্লান্তির আস্বাদ যাঁহারা পাইয়াছেন, তাঁহারাই উপরিউক্ত কথার সার্থকতা নিশ্চয়ই উপলব্ধি করিতে পারিবেন—উহাকে নেহাৎ নিরর্থক ও অন্যায় বলিয়া উড়াইয়া দিতে পারিবেন না।

কারণ যাহাই হউক, এই প্রকার অবসাদের পরিণামে বর্ত্তমানে দেশের অবস্থা দাঁড়াইয়াছে এই যে, ইচ্ছার অভাবে আমরা ভাল গ্রন্থ পড়িতে চাহি না, এবং পাঠকের অভাবে ভাল গ্রন্থ সহজে বাহিরও হয় না। একটী দৃষ্টান্ত দিই। যে অভিব্যক্তিবাদ বা Theory of Evolution-এর ভিত্তিতে বলিতে গেলে আজকাল পাশ্চাত্য ভূখণ্ডের প্রত্যেক কাজটী নিয়ন্ত্রিত হইতেছে, জীবনের প্রত্যেক বিভাগে যে মত প্রযুক্ত হইতেছে, এবং যাহার ন্যায় কৌতূহলপ্রদ আলোচ্য বিষয় খুব অল্পই

আছে, সেই অভিব্যক্তিবাদ সম্বন্ধে আজ শতাব্দীর ভিতরে মাত্র দুই-একখানি গ্রন্থ বঙ্গভাষায় প্রকাশিত হইল !

প্রধানত এই দাসত্বজনিত অবসাদ ও তাহার পরিণামে ব্রহ্মচর্য্য বিসর্জনের ফলে দেশ যে আধ্যাত্মিক, মানসিক ও শারীরিক, সকল বিষয়েই কিরূপ শুকাইয়া যাইতেছে, তাহা আমরা কয়জন ভাল করিয়া ভাবিয়া দেখিতে প্রবৃত্ত হইতেছি ? আমরা ভুলিয়া যাই যে, ব্রহ্মচর্য্যের উপরে ভারতবর্ষ যতটুকু দাঁড়াইতে পারিয়াছিল, ততটুকুই এই পুণ্যভূমি প্রকৃত উন্নতির দিকে অগ্রসর হইয়াছিল। সেই প্রাচীনকালের কথা ছাড়িয়া দিয়া এখনকার বোধগম্য ভাষায় আমরা বলিতে চাহি যে, জর্ম্মানসুলভ বা জাপানীসুলভ কঠোরতা, দৃঢ়তা ও একনিষ্ঠতার উপর দাঁড়াইতে না পারিলে আমাদের জাতীয় উন্নতির আশা সুদূর-পরাহত। কেবল বৃথা বাক্যরাশি বিক্ষিপ্ত করিলেই কখনও দেশের প্রকৃত মঙ্গল সংসাধিত হইতে পারে না।

ইতি শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর কথিত "আর্ট ও
সাহিত্য" কথায় আর্ট ও সাহিত্য
বিষয়ক চতুর্থ কথা সমাপ্ত।

০০০ওঁ০০০

পঞ্চম কথা—আর্টের খাতিরে আর্ট

একে তো দেশ নানা কারণে ব্রহ্মচর্য্যের পথ হইতে অনেকটা দূরে সরিয়া গিয়াছে; তাহার পর যেটুকু বাকী আছে, নব-প্রকাশিত আধুনিক উপন্যাসসমূহের কল্যাণে সেটুকুও বোধ হয় আর বাকী থাকে না। আজকাল যে সমস্ত উপন্যাস মুদ্রাযন্ত্র হইতে উদ্গীর্ণ হইতেছে, তাহাদের অনেকগুলিই দেশকে অধোগতির দিকে টানিয়া লইয়া চলিবার জন্য যেন আড়ে-হাতে লাগিয়াছে। দেশের অধোগতির প্রতি অন্ধ থাকিয়া এই সকল কুৎসিৎ উপন্যাস প্রকাশের অন্যতর প্রধান কারণ হইল আমাদের মজ্জাগত দাসভাব বা slave-mentality। আমরা বাহিরের স্বদেশী আন্দোলনে মাতিয়া চীৎকার করিলে হইবে কি? বর্ত্তমান শাসন-প্রণালী, বর্ত্তমান শিক্ষাপ্রণালী, দেশের দারিদ্র্য প্রভৃতি নানাবিধ কারণ মিলিত হইয়া দেশের প্রাণে দাসভাবকে খুদিয়া বসাইয়া দিয়াছে। আমাদের অন্তরের দাসভাব যে এখনও ত্যাগ করিতে পারি নাই, তাহার পরিচয় পদে পদে দেখিতে পাই। বিলাতী যাহা হৌক একটা কোন ধুয়ার আমদানি হইলেই হইল, সেটী অমনি আমরা গিলিয়া খাইবার জন্য বসিয়া থাকি। এমন কি, আমাদের ধর্ম্ম আজ পর্য্যন্ত পৃথিবীর শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া থাকিলেও, এখনও সেই ধর্ম্ম সম্বন্ধেও পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগের মুখনিঃসৃত কোন

প্রশংসাবাক্য উদ্ধৃত করিতে না পারিলে তাহার শ্রেষ্ঠতা সম্বন্ধে আমরা নিঃসন্দিগ্ধ হইতে পারি না!

সাহিত্যসম্বন্ধে এই প্রকার হলাহলপূর্ণ একটী বিলাতী ধুয়া পাশ্চাত্য জড়জগতের মন্থনে উত্থিত হইয়া এদেশে আসিয়া পৌঁছিয়াছে, এবং এদেশবাসীর আর্টের প্রয়োগপ্রণালীকে বিপথে পরিচালিত করিবার পথ উন্মুক্ত করিয়া দিতেছে। সেই ধুয়াটী হইতেছে art for art's sake—আর্টের খাতিরে আর্ট। একটা চলিত কথা আছে যে, জগতে শতকরা দশজন চিন্তাশীল লোক, যাহারা কিছু চিন্তা করে, নিজেদের মস্তিষ্ক মন্থন করিয়া একটা কিছু উদ্ভাবন করে; আর অবশিষ্ট নব্বই জন আসলে অজ্ঞান, কাজেই "ধামা-ধরা"—যাহারা ভাবিবার, চিন্তা করিবার অবসরের অভাবেই হউক, অথবা অজ্ঞান ও আলস্যবশতই হউক, ঐ দশজনের কথা সম্পূর্ণ অভ্রান্ত বলিয়া ধরিয়া লইতে চাহে। এই স্থলে সুপ্রসিদ্ধ ঔষধবিক্রেতা হলওয়ে সাহেবের একটী গল্প মনে পড়িতেছে। হলওয়ে সামান্য একটু ডাক্তারি পুড়িয়া লক্ষ লক্ষ টাকা রোজগার করিতেছিলেন, আর তাঁহারই এক সহপাঠী চিকিৎসাবিদ্যায় পারদর্শিতা লাভ করিয়াও অতিকষ্টে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেছিলেন। একদিন পথে তাঁহাদের পরস্পরের সাক্ষাৎ হওয়ায় কথায় কথায় সেই সুচিকিৎসক তাঁহার বন্ধু হলওয়েকে তাঁহাদের উভয়ের অর্থাগমের এই প্রভেদের কারণ জিজ্ঞাসা করাতে

হলওয়ে তাঁহাকে স্বগৃহে লইয়া গেলেন এবং বারান্দায় তাঁহাকে দাঁড় করাইয়া অধিকাংশ পথিকের বৃথা ছুটাছুটী দেখাইয়া বুঝাইয়া দিলেন যে, উহাদের মধ্যে বুদ্ধিমান ও ধনী শতকরা দশজনের চিকিৎসার ভার সেই সুচিকিৎসক গ্রহণ করেন, আর বাকী মূর্খ নব্বই জনের মূর্খতা ও অজ্ঞানের উপর হলওয়ে নিজের জীবিকাসংস্থানের ব্যবস্থা করেন। জগতের সকল ক্ষেত্রেই এই কথা—শতকরা দশজন ভাবে, আর শতকরা নব্বই জন মেষপালের ন্যায় অন্ধভাবে সেই দশজনেরই অনুসরণ করে।

ঐ যে বিলাতী ধুয়াটী এদেশে আসিয়াছে, উহাও কোন পাশ্চাত্য চিন্তাশীল কলা-সমালোচক স্বীয় অন্তরের কোন এক ভাবের অভিব্যক্তিতে প্রকাশ করিয়াছিলেন। অনেকেই বোধ হয় অবগত আছেন যে, যে জর্ম্মনিদেশে বিজ্ঞান ও দর্শন পাশ্চাত্য ভূখণ্ডের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক আলোচিত হয়, এবং সেই কারণে যে দেশে অধিকাংশ শিক্ষিত ব্যক্তি সকল বিষয় বিশ্লেষণ করিয়া দেখিবার পক্ষপাতী, সেই জর্ম্মনিদেশেরই এক আর্টসমালোচক আর্টকে বিশ্লেষণের দৃষ্টিতে, চিত্রের অন্যান্য অঙ্গ হইতে আর্টকে পৃথকভাবে দেখিবার হিসাবে সর্ব্বপ্রথম "আর্টের খাতিরে আর্ট" এই তত্ত্ব প্রচার করেন। তাঁহার যে ভাব হইতেই হউক, তিনি এই তত্ত্বটী প্রকাশ করিয়াছিলেন বটে; কিন্তু পরে তাঁহারই ধুয়া-ধরা আর্টিষ্টম্মন্য

অনেক লোক তাঁহার এই উক্তির প্রকৃত মর্ম্ম সম্পূর্ণ উপলব্ধি করিতে না পারিলেও সময়ে-অসময়ে ক্ষেত্রে-অক্ষেত্রে "আর্টের খাতিরে আর্ট" এই কথাগুলির পুনরুক্তি করিতে লাগিলেন। এইরূপ ঐ কথাগুলির পুনরুক্তি করিয়া তাঁহারা আপনাদিগকে ঐ তত্ত্বের সেই আদিম আবিষ্কারকের সহিত জ্ঞানে বিদ্যায় একাসনের অধিকারী বিবেচনা করিয়া এবং জনসাধারণের নিকট সদম্ভে সেই আত্মকৃত অধিকার নানা উপায়ে প্রচার করিয়া মহা আত্মতৃপ্তি লাভ করিতে লাগিলেন।

আবার ইহাঁদের এই কথাগুলির ভিত্তিতে আর্টসমালোচনার কলরব যখন এদেশে আসিয়া পৌঁছিল, তখন এদেশেরও ইংরাজীশিক্ষিত অনেকে আপনাদিগের যশস্পৃহা চরিতার্থ করিবার এমন সহজ সুযোগ ছাড়িতে পারিলেন না। তাঁহারা, আর্টের খাতিরে আর্ট, পাশ্চাত্য ভূখণ্ডে এই তত্ত্বের যে প্রতিধ্বনি উঠিয়াছিল, তাহারও আবার প্রতিধ্বনি এদেশে উঠাইয়া আপনাদিগকে স্বদেশের ক্ষুদ্র জগতে অশেষ অধ্যয়নশীল ও চিন্তাশীল "সমঝদার" কলাসমালোচনা করিবার উপযুক্ত কলাতত্ত্ববিৎ, এক কথায় সাধারণ স্বদেশবাসী অপেক্ষা আপনাদিগকে অনেক উন্নত জীব বলিয়া পরিচিত করিতে ব্যগ্র হইয়া পড়িলেন। তাহার পর, "শতকরা নব্বই জনের" যে দুর্দ্দশা তাঁহাদেরও সেই

দুর্দ্দশা ঘটিল—তাঁহারা বুঝুন আর না বুঝুন, শতমুখে ঐ "আর্টের খাতিরে আর্ট" কথাগুলি আওড়াইয়া বিদ্যা ও জ্ঞানের বড়াই করিয়া মহা আত্মতৃপ্তি লাভ করিতে লাগিলেন।

আমরা জানি না, পাশ্চাত্য ভূখণ্ডে আর্টের খাতিরে আর্ট কথাটী প্রকৃত কি ভাবে লোকেরা গ্রহণ করে। কিন্তু আমাদের দেশে এই কথাটী যে ভাবে গৃহীত হয়, সে ভাবে ধরিলে কথাটীকে নিতান্তই অন্তঃসারহীন একটা কথার কথা মাত্র বলিয়া মনে হয়। আমরা যে কাজই করি, সেই কাজই তো তাহার নিজেরই খাতিরে করিতে হয়। আমাদের আহার-বিহারের কোন্ কাজটাই না তাহার নিজের খাতিরে করি? সুতরাং "আর্টের খাতিরে আর্ট" কথাটীকে একটা বাজে কথার পুনরুক্তি ভিন্ন আর কি বলিব? কিন্তু প্রত্যেক কাজই তাহার নিজের খাতিরে করিতে হইলেও তাহার একটা-না-একটা লক্ষ্য তো থাকিবেই—কোন-না-কোন উদ্দেশ্য না থাকিয়া যাইতেই পারে না। খাওয়ার খাতিরে খাওয়া, কাপড় পরার খাতিরে কাপড় পরা, এই সমস্ত কথা একশতবার উচ্চারণ করিলেও বিশেষ কিছু বলা হইল বলিয়া মনে হয় না। কিন্তু যখন খাওয়া-পরার শরীররক্ষা বা আস্বাদ-গ্রহণ প্রভৃতি একটা কোন উদ্দেশ্য পরিস্ফুট করিয়া দেওয়া হয়, তখনই তাহার বিশেষত্ব বা সার্থকতা ব্যক্ত হইয়া উঠে। সেইরূপ

আর্টের খাতিরে আর্ট বলিয়া শত চীৎকার করিলেও বিশেষ কিছু ব্যক্ত হয় বলিয়া মনে হয় না—বিশেষ কোনই সার্থকতা দেখি না। আর্টকে একটা কোন বিশেষ লক্ষ্য বা উদ্দেশ্যের উপর দাঁড় করাইতেই হইবে, এবং দাঁড় করাইলেই তাহার সার্থকতা। ইতিপূর্ব্বে দেখিয়াও আসিয়াছি যে, জগতের মঙ্গল, স্বাস্থ্য ও উন্নতিসাধনই সেই লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হওয়া উচিত।

আমরা ইতিপূর্ব্বে ইঙ্গিত করিয়া আসিয়াছি যে, আর্টের খাতিরে আর্ট, এই তত্ত্বের আদিম আবিষ্কারক ও প্রচারক সম্ভবত বিশ্লেষণের দৃষ্টিতে পরিপার্শ্ব হইতে আর্টকে পৃথক করিয়া দেখাইবার উদ্দেশ্যেই এই তত্ত্ব প্রচার করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহা কি সম্ভব? আমরা পূর্ব্বে বলিয়া আসিয়াছি এবং আবার বলিতেছি যে, আর্টকে খুঁজিয়া বাহির করিতে গেলে তাহাকে পরিপার্শ্বের ভিতর দিয়াই দেখিতে হইবে; পরিপার্শ্বের সহিত মিলাইয়া দেখিলেই তো আর্টের আর্টত্ব। প্রকৃতির মধ্যে একটা জড় পদার্থকেও আলোচনা করিতে গেলে, তাহাকে বিশ্লেষণ করিয়াই হউক বা অন্য যে ভাবেই হউক, পরিপার্শ্ব হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করিয়া আলোচনা করা অসম্ভব। একটা জীবিত জীবজন্তুকেও আলোচনা করিতে গেলে দেখিতে হইবে যে, সে কোন্ স্থানে বাস করে, তাহার আহার্য্য কি, কি ভাবে সে বিচরণ করে ইত্যাদি। আবার সেই জীবজন্তুকে,

মৃত অবস্থায় আলোচনা করিতে ইচ্ছা করিলেও তাহাকে পরিপার্শ্ব হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখা নিতান্তই অসম্ভব। এই মাত্র বলিতে পারি যে, জীবিত অবস্থা হইতে মৃত অবস্থার পরিপার্শ্ব ভিন্ন হইয়া গেল। কাজেই স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, আর্টের বস্তু উপভোগের ন্যায় একটা মানসিক বৃত্তিকেও তাহার পরিপার্শ্ব বা মনের অন্যান্য অবস্থা, বস্তুটীর অবস্থান, বস্তুটীর উপকরণ, আর্টিষ্টের শিক্ষা-দীক্ষা প্রভৃতি হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্নভাবে ও পৃথক করিয়া দেখা একেবারেই অসম্ভব। সেই কারণে আর্টের বহিরঙ্গ সৌন্দর্য্যকেও অযথা সমালোচনার ছুরিকা দ্বারা বিশ্লেষণ করিয়া উপলব্ধি করানো অসম্ভব। পরিপার্শ্ব হইতে আর্টের বস্তুকে পৃথকভাবে দেখা সম্ভব নহে বলিয়াই চিত্রের সহিত পরিপ্রেক্ষণের একপ্রকার নিত্যসম্বন্ধ বলিলেও চলে। সঙ্গীতেরই বল, আর সাহিত্যেরই বল, সকল বিষয়েরই আর্ট উপভোগ করিতে গেলে তাহাদের পরিপার্শ্বের ভিতর দিয়াই তাহা উপভোগ করিতে হয়। প্রকৃত আর্টকে পরিপার্শ্ব হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া বিশ্লেষণ করিয়া দেখিবার অর্থে প্রাণকে প্রাণন কার্য্য হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখা। ইহার বিপরীতে আমাদের মনে হয় যে, আর্টকে পরিপার্শ্বের সহিত সংশ্লিষ্টভাবেই আলোচনা করিতে হয়, উপভোগ করিতে হয়। এই প্রকার সংশ্লিষ্টভাবেই আর্টের বস্তুকে দেখিতে হয় বলিয়াই তাহা দ্বারা জগতের

মঙ্গল বা অমঙ্গল সাধনের কথা, তাহার সুন্দর-অসুন্দরের কথা স্বতই আসিয়া পড়ে। আর্টের খাতিরে আর্ট, এই কথার মূল্য বা সার্থকতা প্রকৃতই আমাদের উপলব্ধিতে আসে না।

ইতি শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর কথিত "আর্ট ও
সাহিত্য" কথায় আর্টের খাতিরে আর্ট
বিষয়ক পঞ্চম কথা সমাপ্ত।

ষষ্ঠ কথা—আর্ট ও দুর্নীতি।

বিষয়ভেদে আর্টকে—আর্টের প্রয়োগকে মোটামুটি দুইভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে—উন্নতিসাধক ও অবনতিসাধক, কল্যাণকর ও অকল্যাণকর। যাঁহারা আর্টের খাতিরে আর্ট, এই ধুয়ার আশ্রয় গ্রহণ করেন, তাঁহাদের অনেকে এই শেষোক্ত অকল্যাণকর ও অবনতিসাধক আর্টকেই আর্ট বলিয়া ধরেন; এবং পাগল যেমন নিজকৃত কর্ম্মের ফলাফল বুঝিতে না পারিয়া গুরুতর অনিষ্টকর কর্ম্ম করিতেও পশ্চাৎপদ হয় না, সেইরূপ ইহাঁরাও ভ্রান্ত সংস্কারবশত ঐ ধুয়ার দোহাই দিয়া জগতে দুর্নীতি ও অশ্লীলতার যক্ষ্মাবীজ ছড়াইতে কিছুমাত্র দ্বিধা বোধ করেন না। আজকালকার আইনে ক্ষণিক উন্মত্ততাকে আত্মহত্যার কারণ বলিয়া উল্লেখ করা হয়। দুর্নীতি ও অশ্লীলতার যক্ষ্মাবীজ বিক্ষিপ্ত করাকেও আমরা সাময়িক উন্মত্ততার ফল বলিয়া ধরিতে পারি। এই সকল আর্টের নামে উন্মত্ত লেখকেরা মুখে আর্টের খাতিরে আর্ট বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিতে থাকিলেও বস্তুত আর্টকে কিছুতেই পরিপার্শ্ব হইতে পৃথক করিয়া, বিশ্লিষ্ট করিয়া দেখিতে পারেন না এবং দেখেনও না, কারণ তাহা নিতান্তই অসম্ভব। তাঁহারা আর্টকে জগতের মঙ্গলামঙ্গলের সহিত কিছুতেই বিচ্ছিন্ন-সম্বন্ধ করিয়া দেখিতে পারেন না, কারণ তাহা কিছুতেই সম্ভব

হইতে পারে না। তবে তাঁহারা করেন কি? রস্কিন প্রভৃতির ন্যায় মনীষীগণ উন্নত বিষয় ও ভাল ভাবের ভিতর দিয়া আর্টকে দেখিবার এবং দেখিয়া ব্যক্ত করিবার চেষ্টা করিয়া জগতের উন্নতিসাধনে সহায়তা করেন; আর তোমার আমার ন্যায় অবোধ ব্যক্তিরা নিতান্ত অমঙ্গলপ্রসূ বিষয় ও অশ্লীল ভাবের ভিতর দিয়া আর্টকে দেখিয়া ও ব্যক্ত করিবার চেষ্টা করিয়া যক্ষ্মারোগের বীজ ছড়াইয়া জগতের অবনতিসাধনে সহায়তা করি—এই যা' প্রভেদ।

আর্টের খাতিরে আর্ট, এই ধুয়া ধরিয়া আজকাল আমাদের দেশের অনেক বড় বড় সাহিত্যিক কেবল যে আর্টের সার্থকতাকে ব্যর্থ করিতেছেন, তাহা নহে; তাঁহারা বাস্তবিকই দেশের সর্ব্বনাশেরও পথ উন্মুক্ত করিয়া দিতেছেন। বিসুবিয়স আগ্নেয়গিরি হইতে যেমন সময়ে সময়ে ভীষণ অগ্ন্যুৎপাত হইয়া কত নগরপল্লী ভস্মাচ্ছাদিত করিয়া ফেলিয়াছে, সেইরূপ ঐ ধুয়ার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ প্রভাবে এদেশের মুদ্রাযন্ত্র হইতে দুর্নীতি ও অশ্লীলতার অগ্ন্যুদগার ও ভস্মরাশি দেশকে আচ্ছাদিত করিয়া রুদ্ধশ্বাস করিবার জোগাড় করিতেছে।

এই ধুয়ার সঙ্গে সঙ্গে ইহারই যমজ ভাইয়ের মত আরও একটী ধুয়া প্রচারিত হইতেছে—সেটীর নাম realistic আর্ট বা প্রত্যক্ষদ্যোতক আর্ট। যাঁহারা এই প্রত্যক্ষদ্যোতক আর্টের দোহাই দেন, তাঁহারা এমন ভাব দেখান, যেন এই

একটী তাঁহাদের নবাবিষ্কৃত মহা সত্য তত্ত্ব। এটীও আসলে পাশ্চাত্য কথা কয়েকটীর প্রতিধ্বনির প্রতিধ্বনি মাত্র। ইহার মধ্যে আমরা তো কোনই নূতনত্ব দেখিতে পাই না। আর্টের ভিত্তিই যখন সত্য প্রকৃতি, এবং প্রত্যক্ষ পদার্থ ও ভাবসকলও যখন সেই প্রকৃতিরই অন্তর্ভুক্ত, তখন সাধারণ আর্ট হইতে প্রত্যক্ষদ্যোতক আর্টের বিশেষত্ব যে কোথায়, তাহা তো খুঁজিয়া পাই না। তবে দেখিবার মধ্যে দেখিতে পাই এই যে, আর্টের খাতিরে আর্ট এবং প্রত্যক্ষদ্যোতক আর্ট, এই দুইটীর সহযোগে দোহাই দিয়া উচ্চ বিষয়ের ও উন্নত ভাবের পরিবর্ত্তে চারিদিকে এমন বীভৎস, কুৎসিৎ ও অশ্লীল গল্পচিত্র সকল প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে, যাহা ভদ্রসমাজে নিকটসম্পর্কীয় স্ত্রীপুরুষেরও পরস্পরের মধ্যে জোরে পড়া যায় কিনা সন্দেহ। আশ্চর্য্য এই যে, উন্নত ভাবের প্রত্যক্ষ বিষয়ের গল্পচিত্রগুলিকে এপর্য্যন্ত প্রত্যক্ষদ্যোতক আর্টের মধ্যে ফেলা হইয়াছে দেখি নাই।

এই সকল কুৎসিৎ গল্পচিত্রের প্রতিবাদ উঠিলে এক সম্প্রদায় আখর-গাইয়ে লোক ঐ বিলাতী art for art's sake, realistic art প্রভৃতি কতকগুলা বাঁধি কথার প্রতিধ্বনির প্রতিধ্বনি করিয়া সেই চিত্রগুলির সমর্থনে উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়া যান। তাঁহারা এমন ভাবে সদম্ভে কথা বলেন, যেন আর্ট বুঝিবার ও ব্যক্ত করিবার অধিকার তাঁহাদের ব্যতীত অপর কাহারও ঘটে নাই। এই প্রকার অশ্লীল চিত্রের আর্ট বুঝিবার অধিকার তাঁহারা

রাখিতে চান, তাঁহাদের থাক্; কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে যাঁহাদের ছেলেপিলে আছে, বিশেষত যাঁহাদের একটু বয়স্ক পুত্র-কন্যা আছে, তাঁহারা যে ঐ অধিকার লাভের জন্য লালায়িত হইবেন না, তাহা আমরা খুব জোরের সঙ্গে বলিতে পারি। এই সকল বীভৎস কুৎসিৎ চিত্র ও ভাব হইতে সন্তানগণের মনকে বাঁচাইবার জন্য বুদ্ধিমান পিতা-মাতাকে যে কি ভয়ভাবনায় পড়িয়া যাইতে হয়, তাহা একমাত্র অন্তর্যামীই জানেন।

বাল্যকালে কথামালায় একটী গল্প পড়িয়াছিলাম। এক পুষ্করিণীতে কতকগুলি ভেক আনন্দে সন্তরণ করিতেছিল। ইতিমধ্যে কয়েকটী বালক তাহাদের প্রতি ঢিল ছুড়িতে আরম্ভ করিল। ভেকরাজ বালকদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিল—"বালকগণ! এই ঢিল ছুড়িয়া তোমরা আমোদ পাইতেছ বটে, কিন্তু আমাদের মৃত্যুর কারণ হইতেছে।" যে সকল সাহিত্যিক বিলাত হইতে আমদানি কতকগুলি ফাঁকা কথার দোহাই দিয়া অশ্লীল কুৎসিৎ গল্পচিত্র প্রভৃতি প্রকাশ করেন, তাঁহাদিগকেও সম্বোধন করিয়া আমাদের বলিতে ইচ্ছা হয়, "হে সাহিত্যমহারথীগণ! দোহাই আপনাদের! এইরূপ গল্পচিত্র প্রভৃতি প্রকাশের ফলে আপনাদের হস্তকণ্ডূয়নের নিবৃত্তি হইতে পারে বটে, আপনাদের যশস্পৃহা চরিতার্থ হইতে পারে বটে, এবং আপনাদের মনের উদারতারও পরিচয় পাওয়া যাইতে পারে বটে, কিন্তু এগুলি দেশের মৃত্যুর কারণ মরণবায়ু।"

দুর্নীতি ও অশ্লীলতার অর্থ কি? আজকালকার দিনে আমরা ইহাদিগকে যে অর্থে গ্রহণ করি, আমাদের সহজ জ্ঞানে আলোচনা করিয়া সেই অর্থে আমরা এইটুকু বুঝি যে, যে সকল বিষয় দর্শন শ্রবণ স্পর্শন বা মননে আমাদের অন্তরে কামভাব অতিমাত্রায় জাগ্রত হয় এবং যাহা আমাদের মনুষ্যত্ব নষ্ট করিয়া আমাদিগকে পশুদের সহিত সমস্তরে নামাইতে চেষ্টা করে, আমাদের কল্যাণের পথে, উন্নতির অভিমুখে, চলিবার পথ রুদ্ধ করিয়া দেয়, তাহাই দুর্নীতি ও অশ্লীলপদবাচ্য। যে সকল বিষয় আমাদের হৃদয়কে দেবত্বের দিকে উন্নীত করে, অন্তত মনুষ্যত্ব বিনষ্ট হইতে দেয় না, সেইগুলিই শ্লীল শ্রেণীর মধ্যে ধর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচনা করি। কাজেই আমরা ধরিতে পারি যে, মঙ্গলভাবই অথবা ভগবানের শিবস্বরূপই শ্লীলতার মূল ভিত্তি ও আদর্শ। এই পুরুষের দেহ, এই রমণীর দেহ, এই কামবৃত্তি প্রভৃতি লইয়া তুমি আমি এমনভাবে নাড়াচাড়া করিতেছি যে, তাহার ফলে সমাজের পূর্ব্ব হইতেই জীর্ণ শরীরে অশ্লীলতার বিষবীজ প্রবেশ করিয়া সমাজকে একেবারে সর্ব্বনাশের পথে লইয়া যাইতে উদ্যুক্ত হইয়া বসিয়া আছে, সমাজকে ফোঁপরা করিবার ব্যবস্থা করিতেছে; অথচ সেই সকল বিষয় লইয়াই মার্কিন কবি ওয়াল্ট হুইটম্যান এমনভাবে কবিতা লিখিয়াছেন যে, সেই সকল কবিতা পাঠ করিলে মানুষের মন এক অপূর্ব্ব দেবভাবে সংগঠিত হইয়া উঠে। এই-

রূপে আমরা যে দিক দিয়াই দেখিতে যাই, সেই দিক দিয়াই দেখি যে, জগতের মঙ্গলসাধনে, শ্লীলতার প্রসারসাধনেই প্রকৃত আর্টের সার্থকতা।

এদেশের বর্ত্তমান সাহিত্যজগতে আর্টের দোহাই দিয়া যে সকল অশ্লীল ও দুর্নীতিপ্রবণ উপন্যাস বাহির হইতেছে, সত্য কথা বলিতে কি, লেখকদিগের কিছু আশাতীত অর্থাগম ও পাণ্ডিত্যের অতিমাত্র অভিমান সার্থক হওয়া ব্যতীত তাহাতে আর কি লাভ হয় জানি না। ইহার বিপরীতে আমরা বরঞ্চ দেখি যে, ঐ প্রকার উপন্যাসের পরিণামে লেখকদিগের পরিবারে, সমাজে ও দেশে বিষবৃক্ষের "বিষকুম্ভং পয়োমুখং" বীজ সকল অঙ্কুরিত হইয়া সু-দৃশ্য, কিন্তু মৃত্যুর উপবনে পরিণত হয়, এবং সেই উপবন হইতে এক ভয়ানক বিষবায়ু সৃষ্ট হইয়া লোকসকলকে মৃত্যুর করাল গ্রাসে আকর্ষণ করিতে থাকে। লেখকেরা কি মরুভূমির মাঝে, শ্মশানের মাঝে, অর্থের স্তূপের উপর বসিয়া তৃপ্তি লাভ করিবেন? অর্থশোষণের ফলে যদি রাজ্যের প্রজা শুকাইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়, তবে রাজা রাজ্য করিবেন কাহাকে লইয়া? খাজনা আদায় হইবে কাহার নিকটে? রাজার সুশাসনের বন্দোবস্ত উপলব্ধিই বা করিবে কে? সেই প্রকার, তোমাদের পাঠকেরা অশ্লীলতা ও দুর্নীতির যক্ষ্মাবিষে জর্জ্জরিত হইয়া মৃত্যুমুখে পড়িলে, দুইদিন বাদে, তোমাদের ঐ আর্টের খাতিরে আর্ট ও প্রত্যক্ষদ্যোতক আর্ট,

এই দুই নবাবিষ্কৃত মহান্ তত্ত্বে পূর্ণ উপন্যাসগুলি পড়িবে কে? তখন তোমরা হয়তো ইহলোকে না-ও থাকিতে পার, কিন্তু যদি কখনও পরলোক হইতে ফিরিয়া আস, তবে নিশ্চয়ই দেখিবে যে, তোমরা এদেশের ধর্ম্মে, নীতিতে, শরীরে ও মনে তোমাদের কি সুমহান্ কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছ—একটা বিরাট—বিশাল—শ্মশান—শ্মশান—শ্মশান!

মন্দ বস্তুকে কখনও লোকদৃষ্টিতে বড় করিয়া তুলিয়া ধরিতে নাই। যে কামভাবকে এই সকল ঔপন্যাসিক তাঁহাদের চিত্রের ভিত্তি করেন, ভগবৎবিধানে তো তাহা মনুষ্যের মধ্যে নিম্নস্তরের জীবজন্তুদের সমানই প্রবলভাবে জাগ্রত আছে। সেই কামভাবকে যে কোন উপায়ে বড় করিয়া ধরিলেই, তাহার মনুষ্যত্বধ্বংসী আকারকে সুন্দর মনোমুগ্ধকর মূর্ত্তিতে দাঁড় করাইলেই অবোধ পাঠক-পাঠিকাগণ নিজেদের জীবনে তাহার অভিনয় করিতে গিয়া আপনাদিগকে যে পশুদের সঙ্গে সমস্তরে নামাইয়া ফেলিবার ব্যবস্থা করিবে, তাহা কিছুই আশ্চর্য্য নহে। এই কারণে যে সকল মনোবৃত্তি উদ্দাম হইয়া জীবনের সার মনুষ্যত্বকে ভাসাইয়া লইয়া যায়, সে সকল মনোবৃত্তিকে সংযমের বাঁধ দিয়া ঘিরিয়া রাখাই কর্ত্তব্য; এবং অন্যান্য ক্ষেত্রের পথ-প্রদর্শক নেতাদের ন্যায় সাহিত্যক্ষেত্রের নেতাদের এই সংযম আনয়নে সহায়তা করা কর্ত্তব্য। সংযম ধ্বংস করিবার সহায়তা করিলে তাঁহাদের ধামা-ধরা সম্প্রদায় দুই চারি দিনের জন্য

তাঁহাদের কার্য্যে বাহবা দিতে পারেন। কিন্তু আমরা তাঁহাদিগকে নিঃসংশয়ে বলিতে পারি যে, সে কার্য্যের জন্য ভবিষ্যৎবংশীয়দের নিকট কখনই তাঁহাদের পৌরুষ ঘোষিত হইবে না, প্রত্যুত ইহার জন্য তাঁহারা চিরকাল নিন্দাস্পদ হইয়া থাকিবেন।

আসল কথা এই যে, যে সংযমের বলে ভারতের নিজস্ব রমণীর মাতৃত্ব আমরা উপলব্ধি করিতে পারিতাম, সে সংযম আমরা হারাইয়াছি; হৃদয়ের সে মহত্ত্ব, সে উদারতা আমরা বিসর্জ্জন দিয়াছি। তৎপরিবর্ত্তে দাসভাবকে slave-mentalityকে বন্ধুবোধে আলিঙ্গন করিয়া পাশ্চাত্যদের অনুকরণে "প্রিয়াসাধনে" অগ্রসর! এই ভাবের প্রিয়াসাধন খুবই সহজ—নিজে নষ্ট হইয়া অপরকে নষ্ট করিবার ব্যবস্থা দেওয়া খুবই সহজ। কিন্তু প্রাণের ভিতর মাতৃভাবের সাধনা সংসিদ্ধ করিয়া তুলিতে চাহিলে সংযম চাই, ধৈর্য্য চাই, ব্রহ্মচর্য্য চাই। একটী কথা আমরা ভুলিয়া যাই যে, এই প্রিয়াসাধন সহজ হইলেও আসলে ইহার প্রচারে আমাদের অধিকার নাই। এক তো, আমার নিজেকে নষ্ট করিয়া আত্মঘাতী হইবার অধিকার আমার নাই; তার পর, যদি বা আমি নিজেকে নষ্ট করিতে উদ্যত হই, তাহা হইলেও অপরকে ধ্বংসের পথে লইয়া যাইবার কোনই অধিকার আমার নাই। আমি মন্দ হইতে পারি, তুমি মন্দ হইতে পার, কিন্তু মন্দকে ভাল বলিয়া

আমাদের পরবর্ত্তী বংশের পর বংশকে মন্দের পথে, বিপথে চলিবার ব্যবস্থা দিবার অধিকার কিছুতেই আমাদের থাকিতে পারে না। সত্য-শিব-সুন্দর ভগবান যখন আর্টের কেন্দ্র, তখন আর্টের মধ্যে মন্দ বিষয়কে, মন্দ ভাবকে আনিয়া ফেলাই অত্যন্ত অন্যায়; "মন্দকে ভাল বাসিয়া একটুখানি মন্দ হইবার" কথাও উল্লেখ করা যেমন ভগবৎবিধানের বিরুদ্ধ, তেমনি উহা যুক্তিবিরুদ্ধ. এবং তেমনি উহা আর্টের মূলমন্ত্রের বিরুদ্ধ। আস্তাকুঁড়ের পচা জিনিস যদি দূরে সরাইবার ক্ষমতা আমাদের না থাকে, তবে তাহা ঘাঁটিয়া ঘুঁটিয়া নিজের বাসগৃহে পচা গন্ধ বিস্তারে সহায়তা করাকে উন্মাদরোগীর বাতুলতা ব্যতীত আর কোন নাম দেওয়া যাইতে পারে না।

ইতি শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর কথিত "আর্ট ও
সাহিত্য" কথায় আর্ট ও দুর্নীতি
বিষয়ক ষষ্ঠ কথা সমাপ্ত।

ও

সপ্তম কথা—আর্ট ও মনীষীমত।

ভগবান যখন আর্টের কেন্দ্র, তখন বলা বাহুল্য যে, আর্টের মূলমন্ত্র সম্বন্ধেও দেশ-বিদেশের মনীষীদিগের মত একই হইবে। কিন্তু তাই বলিয়া ইহা মনে করা ভুল যে, কাহারও কাহারও মত বিভিন্ন বা বিপরীত হইবে না। এই বিশ্বচরাচর ব্যাপ্ত করিয়া ভগবান তো নিত্য বর্ত্তমান আছেন; সাধারণতঃ শ্রদ্ধাবান ব্যক্তিগণ তাহা একবাক্যে স্বীকার করিলেও, এমনও লোক কি নাই, যাঁহারা সে কথা অস্বীকার করেন? কিন্তু সেই অস্বীকার করিবার কারণে ভগবৎসত্তার নিশ্চয়ই অভাব হয় না। অন্তরে যে ব্রহ্মজ্ঞানরূপ স্বর্গীয় অগ্নি নিহিত আছে, তাহাই তখন সেই অস্বীকারের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া প্রতিবাদ করিতে থাকে। সেইরূপ আর্টের মূলমন্ত্রের বিরুদ্ধে যাঁহারা মত প্রকাশ করেন, আমরা দেখি যে, তাঁহাদের স্বীয় কার্য্য হইতেই তাঁহাদের মতের ভুল ধরা পড়ে।

ভগবান আর্টের কেন্দ্র, এইটী হইল আর্টের অন্তরের সর্ব্বমূল কথা। সেই মূল বিন্দু হইতে নামিয়া আর্টের অন্যান্য মন্ত্রগুলি অবরোহ-প্রণালীতে ধরিলে তো কোন কথাই ছিল না—বিচার আলোচনারও কোন প্রয়োজন থাকিত না, আর বিবাদবিসম্বাদেরও কোন সম্ভাবনা থাকিত না। এই সূক্ষ্ম কথা আমরা গ্রন্থের সর্ব্বপ্রথমে আমাদের সাধ্যমত খুলিয়া বলিবার চেষ্টা করিয়াছি।

তথাপি মনে হয় যে, ইহা অনেকের ধারণার অতীত। তাই আমরা সেই অন্তরের কথা পুনরায় বুঝাইবার চেষ্টা না করিয়া, বহির্জগতের সহিত আর্টের যে যোগ, যাহার ফলে আর্ট আমাদের সম্মুখে মূর্ত্ত হইয়া প্রকাশ পাইতে চায়, সেই যোগ ধরিয়াই এক্ষণে আলোচনা করিয়া দেখিব যে, সেই যোগের সূত্র-মন্ত্রগুলিও ঐ কেন্দ্র ভগবান হইতেই অভিব্যক্ত হইয়া নামিয়া আসিয়াছে, এবং আসলে সেই মন্ত্রগুলি সার্ব্বভৌমিক।

আমরা "আর্ট ও সত্য" প্রবন্ধে ইহাও দেখিয়া আসিয়াছি যে, সত্যস্বরূপ ভগবান যে প্রকৃতির অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, ভগবান হইতে এই যে প্রকৃতি নিশ্বসিত হইয়াছে, সেই সত্য প্রকৃতিই, সংক্ষেপে সত্যই প্রকৃত আর্টের ভিত্তি। এই প্রকৃতির ভিতর দিয়াই বহির্জগতের সহিত আর্টের যোগ। আমরা যত দূর বুঝি, তাহাতে মনে হয় যে, এ বিষয়ে মতদ্বৈধ নাই। মতদ্বৈধ থাকিলেও আমরা তাহা গ্রাহ্য করিতে পারি না, কারণ আমরা যতই কেন কল্পনায় নিজেকে ভাসাইয়া দিই না, প্রকৃতির বাহিরে আমরা কিছুতেই যাইতে পারি না। আর্টের ভিত্তি যদি অতি-প্রাকৃত কোন কিছু না হয়, প্রকৃতিই যদি তাহার ভিত্তি হয়, তবে স্বতই প্রতিপন্ন হইবে যে, প্রকৃতিসিদ্ধতা বা স্বাভাবিকতাই আর্টের প্রাণ। কাজেই বলিতে হয় যে, আর্টে অস্বাভাবিক কোন কিছু স্থান তো পাইতেই পারে না, এবং পাইলেও তাহা হেয় ও পরিত্যাজ্য হইবে।

আর একটী বিষয় সর্ব্ববাদসম্মত। আর্টের লক্ষ্য বস্তু যে সুন্দর হইবে, অথবা তাহা সুন্দর না হইলেও তাহাকে যে সুন্দর করিয়া তুলিতে হইবে, এবিষয়ে মতদ্বৈধ দেখা যায় না। আর্টের বস্তু যদি সুন্দরই না হইল, তবে তাহার তো কিছুই রহিল না। আর্টের সহিত সৌন্দর্য্যের এতই অপরিহার্য্য ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ যে, অনেক সময়ে বিদ্বান ও জ্ঞানী ব্যক্তিরাও বাহিরের সৌন্দর্য্যকেই আর্ট মনে করিয়া গুরুতর ভ্রমে পতিত হন। সুন্দর-স্বরূপ ভগবান তাঁহার প্রকৃতির বহিঃপরিচ্ছদস্বরূপে সৌন্দর্য্য ঢালিয়া দিয়াছেন সত্য, কিন্তু সেই সৌন্দর্য্যের প্রত্যেক অংশে মঙ্গলভাবও নিহিত করিয়া দিয়াছেন, এই কারণে প্রকৃতির বহিরাকার সৌন্দর্য্য-মাত্রেও আর্ট থাকিতেই হইবে। কিন্তু আমরা প্রকৃতিকে অনুসরণ করিতে গিয়া অনেক সময়ে আমাদের চিত্রাদিতে কেবলমাত্র বহিঃসৌন্দর্য্যটুকুকেই আর্ট বলিয়া ব্যক্ত করিতে চাই, তাহার অন্তরস্থিত মঙ্গলভাবকে দেখিতে ভুলিয়া যাই এবং ঐ সৌন্দর্য্যের মধ্যে তাহা ব্যক্ত করিতে সকল সময়ে চেষ্টাও করি-না।

এই কারণে আর্টের সঙ্গে যেটুকু মঙ্গলের যোগ, সেইটুকু লইয়াই যাহা কিছু বিতর্ক বিরোধ দেখা যায়। আমরা দেখিয়া আসিয়াছি যে, আর্টের উদ্দেশ্য বটে, অন্ততঃ উদ্দেশ্য হওয়া উচিত—জগতের স্বাস্থ্যসাধন, জগতের মঙ্গল ও উন্নতিসাধন। কিন্তু যাঁহারা আর্টের খাতিরে আর্ট, প্রত্যক্ষদ্যোতক আর্ট

প্রভৃতি পাশ্চাত্যভূখণ্ডের আমদানি কথা হৃদয়ে ধারণ করিয়া রাখিয়াছেন, তাঁহারা ইহা স্বীকার করিতে চাহেন না। তাঁহাদের বক্তব্য আলোচনা করিয়া মনে হয় যে, সৌন্দর্য্যরূপ মাত্র বহিরঙ্গটুকু একটু চকচকে করিয়া লোকসমক্ষে ধারণ করিলেই তাঁহারা তাহাকে আর্ট বলিয়া গ্রহণ করিতে প্রস্তুত আছেন—তাঁহারা আর্টের ভিতরের কথা যেন আমলেই আনিতে চাহেন না বলিয়াই মনে হয়। ইহাঁদের মনের এইরূপ ভাব দেখিয়া বেলগাছিয়া বাগানের দুইটী চিত্রের গল্প মনে পড়ে। পূজ্যপাদ দ্বারকানাথ ঠাকুরের পরলোক গমনের পর ঐ বাগানের যে সকল দ্রব্য বিক্রয়ের জন্য রাখা হইয়াছিল, তন্মধ্যে দুইটী চিত্র ছিল—একটী চিত্র কোন অপ্রসিদ্ধ চিত্রকরের অঙ্কিত এবং খুবই অল্প মূল্যের ; দ্বিতীয়টী ইউরোপের কোন সুপ্রসিদ্ধ চিত্রকরের অঙ্কিত ও বহুমূল্য ছিল। প্রথম চিত্রের মূল্যহীনতা ঢাকিয়া অধিক মূল্যে বিক্রয়ের সুবিধা করিবার জন্য তাহাকে কারুকার্য্যে খচিত মূল্যবান কাষ্ঠবন্ধনে বাঁধানো হইয়াছিল ; দ্বিতীয় চিত্রটী যৎসামান্য বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া নিজের অন্তর্গৌরবে নীরবভাবে ক্রেতার অপেক্ষা করিতেছিল। ইতিমধ্যে এক ক্রেতা ঐ প্রকৃত বহুমূল্য চিত্রটীর বেশের দুর্দ্দশা দেখিয়া তাহার প্রতি ভ্রূক্ষেপমাত্র না করিয়া সেই মূল্যবান বহিরঙ্গে শোভিত চিত্রটীকেই উপযুক্ত মূল্য অপেক্ষা অনেক অধিক মূল্যে ক্রয় করিয়া নিজের আর্টসম্বন্ধীয় অজ্ঞতাই প্রকাশ

করিলেন; তাহাতে দ্বিতীয় চিত্রটীর গৌরবের কিছুমাত্র হ্রাস হইল না। ক্রেতার এরূপ ভ্রমের কারণ এই যে তিনি চিত্র দুইটীর অন্তরের প্রতি মনোযোগ দেওয়া আবশ্যক মনে করেন নাই।

শুধু বহিঃসৌন্দর্য্যকেই যদি কেহ আর্ট বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে চাহেন—ভাল কথা; কিন্তু তাঁহাকে আর্টেরই দিক হইতে সম্পূর্ণ-ভাবে সেই সৌন্দর্য্যকেও দেখিতে ও দেখাইতে হইবে। তখন সেই সৌন্দর্য্যরূপ বহিরঙ্গকেই আর্টের বস্তু হইতে পৃথকভাবে আলোচনা করিয়া দেখাইতে হইবে যে, সেই সৌন্দর্য্যটুকুরও কেন্দ্র আর্টের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা সত্যশিবসুন্দর ভগবান; সেই সৌন্দর্য্যটুকুরও ভিত্তি সত্যপ্রকৃতি; সেই সৌন্দর্য্যটুকুরও প্রাণ স্বাভাবিকতা; তাহারও লক্ষ্য জগতের মঙ্গল ও উন্নতি-সাধন এবং সেই সৌন্দর্য্যটুকুও আবার প্রকৃত সৌন্দর্য্যে উদ্ভাসিত।

অন্তরঙ্গ মঙ্গলভাবকে ছাড়িয়া, সমস্ত পরিপার্শ্বের সহিত সম্বন্ধ ছাড়াইয়া কেবল বহিঃসৌন্দর্য্য ধরিয়া কোন বস্তুকে আর্টের বস্তু বলিয়া আমরা উপলব্ধি করিতে পারি কিনা সন্দেহ। যাঁহারা আর্টের বহিঃসৌন্দর্য্যকেই আর্ট বলিয়া ধরিতে চাহেন, অন্তরঙ্গ মঙ্গলভাবের সহিত বহিঃসৌন্দর্য্যের কোন যোগবন্ধন স্বীকার করিতে চাহেন না, তাঁহাদিগকে আমরা এইটুকু জিজ্ঞাসা করি—তাঁহারা কেবল বহিঃসৌন্দর্য্যের ভিত্তির

উপর যে আর্টের বস্তু রচনা করিবেন, তাহা দ্বারা তাঁহারা কি চাহেন? তাঁহাদের সেই রচনা দ্বারা অন্তত তাঁহাদের একটা সুনাম হইবে, এটুকুও তো তাঁহারা চাহেন? তাঁহারা নিশ্চয়ই চাহেন না যে, তাঁহাদের রচনা দ্বারা জগতের অমঙ্গল হউক, অথবা তাঁহাদের দুর্ণাম হউক। সূক্ষ্মভাবে আলোচনা করিলে, ইহা হইতেই তো প্রতীতি হইবে যে, আর্টের বস্তুকে যতই কেন বহিঃসৌন্দর্য্যে সজ্জিত করা হউক না, মঙ্গলভাব তাহাতে অন্তঃসলিলভাবে নিগূঢ় মূর্ত্তিতে না থাকিয়া যাইতে পারে না।

আমাদের দেশের ঋষিমুনি পণ্ডিতেরা এই সূক্ষ্মতত্ত্বটী বড়ই পরিষ্কারভাবে অন্তরে উপলব্ধি করিয়াছিলেন। তাই শ্রুতিতে শিবস্বরূপ ভগবানকে সৌন্দর্য্যের নিষ্কর্ষহিসাবে রস-স্বরূপ বলিয়া, বলিতে গেলে তাঁহাকেই সমস্ত আর্টের মূলে স্থাপন করা হইয়াছে। সুপ্রসিদ্ধ আলঙ্কারিক মম্মটভট্ট কাব্যের প্রয়োজন বলিতে গিয়া প্রকারান্তরে আর্টের উদ্দেশ্য সুস্পষ্ট ভাষায় বলিয়া গিয়াছেন। তাঁহার মতে কাব্য-(যাহা আর্টের বস্তুসমূহের অন্যতর) রচনার উদ্দেশ্য হইতেছে—"যশ, অর্থ, আচারব্যবহারের জ্ঞানবিস্তার (যথা, রাম প্রভৃতির ন্যায় সংসারে চলা উচিত, রাবণ প্রভৃতির ন্যায় নহে, এই প্রকার), অমঙ্গলনাশ, সদ্য সদ্য আনন্দলাভ, এবং সাধ্বী-স্ত্রীর ন্যায় সুমিষ্টভাবে উপদেশপ্রদান"। ইহার মধ্যে যশ ও অর্থকে

আমরা কাব্য প্রভৃতি আর্টের বস্তু-রচনার ফল বলিয়া ধরিতে পারি। আলঙ্কারিক মম্মট ভট্টের উক্তি ধীরভাবে আলোচনা করিলেই বুঝা যায় যে, তাঁহার মতে জ্ঞানবিস্তারের সাহায্যে অমঙ্গলনাশ এবং মিষ্টতা বা সৌন্দর্য্যের ভিতর দিয়া মঙ্গলসাধনই হইল কাব্যরচনার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। ভারতের প্রাচীন ও আধুনিক সংস্কৃত কাব্য এই মন্ত্রই চক্ষের সম্মুখে রাখিয়া রচিত হইয়াছে।

পাশ্চাত্য ভূখণ্ডেও আমরা এই ভাবেরই নানা প্রতিধ্বনি পাই। সুপ্রসিদ্ধ গ্রীক দার্শনিক প্লেটো বলিয়াছেন "যাহা উপকারে আসিবে, তাহাই শ্রেষ্ঠ, যাহা ক্ষতিকারক, তাহাই অশ্রেষ্ঠ"। বৌমগার্টেন বলেন যে, প্রকৃতিতেই সৌন্দর্য্যের চূড়ান্ত আদর্শ পাওয়া যায়, এবং প্রকৃতির অনুকরণ করাই আর্টের সর্ব্বপ্রধান লক্ষ্য। * সুলজার, মেণ্ডেলসহ্ন্ এবং মরিজ্, ইহাঁরা বলেন যে, মঙ্গলই আর্টের লক্ষ্য, সৌন্দর্য্য নহে। * মেণ্ডেলসহ্ন্ বলেন যে, নৈতিক উৎকর্ষই আর্টের লক্ষ্য। * য্যাফ্‌টুস্‌বেরির মতে যাহা সুন্দর তাহাই সত্য এবং যাহা সত্য ও সুন্দর তাহাই মঙ্গল; ঈশ্বর, সৌন্দর্য্য ও মঙ্গলভাব উভয়েরই মূল। * ফিহ্‌কটের মতে আর্টের লক্ষ্য সমস্ত মানবত্বের অনুশীলনা। * যেলিঙ্গের মতে সসীমের মধ্যে

---

* উদ্ধৃত উক্তিগুলি কাউণ্ট টল্‌স্টয় লিখিত "আর্ট কি" গ্রন্থের ৩য় অধ্যায় হইতে গৃহীত।

অসীমের উপলব্ধিই সৌন্দর্য্য।* হেগেলের মতে আমাদের সত্য ও সুন্দর মূলে এক।* কুজ্যাঁর মতে সৌন্দর্য্যের মূল ভিত্তি সুনীতি।* গুইয়োর মতে আমাদের উচ্চতম চিন্তা ও অনুভূতির বহির্বিকাশেই আর্টের পরিণতি।* কসটার বলেন, ঈশ্বর সত্য-শিব-সুন্দর, এবং এই সত্য, শিব ও সুন্দরের ভাব আমাদের অন্তরে নিহিত।* সার টমাস ব্রাউন বলেন, প্রকৃতির পরিণতিই আর্ট; ভগবানের আর্টের নামই প্রকৃতি।† হ্যাজলিট্ বলেন যে, প্রকৃতির সহিত আর্টের যোগবদ্ধ হইয়া থাকা চাই†। জুবেয়ার বলেন, আর্টের মধ্যে যাহা সুন্দর তাহাই হিতকর, প্রয়োজনীয়; আর্ট মনকে উন্নত করে বলিয়া উহা নীতিবিদেরও পক্ষে আবশ্যক†। রস্কিন বলেন, উদার মহৎ হৃদয়ের অভিব্যক্তিই আর্ট; যে উপায়েই হউক দর্শকের হৃদয়ে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে সর্ব্বোচ্চ ভাবের উদ্রেক করাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আর্ট—উন্নত মনোবৃত্তিকে আশ্রয় করিয়া যে ভাব যে পরিমাণে উহাকে অধিকতর উন্নত করিতে পারে, সেই অনুপাতে সেই ভাব উচ্চ†। রস্কিন আরও বলেন, আর্টের বিভিন্ন চতুষ্পাঠীর প্রত্যেকটীর দ্বারে আমি উজ্জ্বল স্বর্ণাক্ষরে খোদিত রাখিতে চাই—সংযম†। বিলার বলেন, আর্ট প্রকৃতির দক্ষিণ হস্ত†। কাউণ্ট টলস্টয়ের মতে মান-

* উদ্ধৃত উক্তিগুলি কাউণ্ট টলস্টয় লিখিত "আর্ট কি" গ্রন্থের ৩য় অধ্যায় হইতে গৃহীত।

† নারায়ণ মাঘ ১৩২৩।

যের মঙ্গলসাধনই আর্টের লক্ষ্য।* এমার্সন বলেন যে, বিশ্বচরাচরের নিয়ন্তা যিনি, তিনি সত্যস্বরূপ ও মঙ্গলস্বরূপ; তাঁহা হইতেই প্রকৃতির প্রয়োজনীয় বা সুন্দর, সর্ব্বপ্রকার আর্টই অভিব্যক্ত হইয়াছে; আমরা যখন সর্ব্ববিষয়েই প্রকৃতির অনুসরণ করিতে বাধ্য, তখন আমাদেরও আর্টকে স্থায়িত্ব দিতে চাহিলে তাহাকে সুনীতি দ্বারা আচ্ছাদিত করিতে হইবে।† আর্ট, বিশ্বচরাচরে, সৃষ্টির মূল প্রাণ।†

উপরোক্ত উক্তিসমূহ হইতে স্পষ্ট দেখা যায় যে, আর্ট বস্তুত ভগবৎ-কেন্দ্রক বলিয়াই আর্টসম্বন্ধীয় সাধারণ মূলতত্ত্বগুলিও দেশনির্বিশেষে সমভাবেই স্বীকৃত। তাই বলিয়া এবিষয়ে বিরোধী মত যে দেখা যায় না তাহা নহে। এক পাশ্চাত্য-ভূখণ্ডেরই তো পণ্ডিতদিগের মধ্যেও এই প্রকার বিরোধী মত দৃষ্ট হয়। বিন্ কোলম্যান নামক এক লেখক বহিঃসৌন্দর্য্যটুকুকেই আর্টের লক্ষ্য বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন—সে সৌন্দর্য্যের সঙ্গে মঙ্গলভাবের কোনই সম্পর্ক নাই। এইরূপ মাত্র

* টল্‌স্টয় লিখিত What is Art গ্রন্থ এবং শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সিংহ লিখিত "সাহিত্যের স্বাস্থ্যরক্ষা"।

† Emerson's Complete Prose Works—Essay on Art।

বহিরিন্দ্রিয়গ্রাহ্য সৌন্দর্য্যটুকুকেই সমস্ত আর্টের লক্ষ্য বা সার বলা যে কতদূর অসার কথা, যাঁহারা এপর্য্যন্ত ইতিপূর্ব্বে কথিত আমাদের মন্তব্যসকল প্রণিধান পূর্ব্বক আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারাই তাহা উপলব্ধি করিবেন। আরও অনেক লেখককে সম্পূর্ণ এই পথে না হইলেও প্রথমোক্ত পথ হইতে অনেকটা ভিন্ন পথে যাইতে দেখা যায়। এক সময়ে বিজ্ঞানের নব-অভ্যুদয় যুগে অনেক বৈজ্ঞানিক ঈশ্বরের অস্তিত্বই অস্বীকার করিতেন। ক্রমে বিজ্ঞান যতই গভীর-ভাবে আলোচিত হইতে লাগিল, ততই দেখা যাইতে লাগিল যে, বিজ্ঞানের নিয়মের সঙ্গে তাহাদের এক নিয়ন্তাও স্বীকার না করিলে চলিতেই পারে না। সেইরূপ আর্টের এই নব-অভ্যুদয় যুগে আর্টের বহিরঙ্গ বাহ্যিক সৌন্দর্য্যের মহিমায় মুগ্ধ হইয়া যতই কেন তাহাকে তাহার কেন্দ্র ভগবান এবং তাহার লক্ষ্য অন্তরঙ্গ মঙ্গলভাব হইতে পৃথক করিয়া উপলব্ধি করিবার চেষ্টা করা হউক না, সময়ে মানবের অন্তর্নিহিত শক্তিবলেই তাহাকে উপলব্ধি করিতে হইবে যে, আর্টকে যেমন তাহার বহিরঙ্গ বাহ্যিক সৌন্দর্য্য হইতেও পৃথক করা যায় না, সেইরূপ তাহাকে তাহার কেন্দ্র ভগবান বা তাহার লক্ষ্য মঙ্গলভাব হইতে বা তাহার প্রাণ প্রকৃতিসিদ্ধ স্বাভা-বিকতা হইতে কিছুতেই সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখা যাইতে পারে না। প্রকৃতি, স্বাভাবিকতা, মঙ্গলভাব, সৌন্দর্য্য এবং

ভগবান, এই সমস্তকে লইয়া, সমস্তের সঙ্গে যোগসংবদ্ধভাবে আর্টকে সমগ্র দৃষ্টিতে দেখিতে হইবে।

ইতি শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর কথিত "আর্ট ও
সাহিত্য" কথায় আর্ট ও মনীষীমত
বিষয়ক সপ্তম কথা সমাপ্ত।

ওঁ

অষ্টম কথা—আর্ট ও প্রকৃতি।

ভগবান যেমন আর্টের কেন্দ্র, প্রকৃতি তেমনি আর্টের ভিত্তি, ইহা আমরা পূর্ব্বে অনেকবার বলিয়া আসিয়াছি। সেই একই কেন্দ্র হইতে প্রকৃতির বিভিন্ন বিভাগ যে অভিব্যক্ত হইয়াছে, ইহা তো দর্শনশাস্ত্র স্পষ্টরূপে প্রমাণ করিয়া বসিয়াছে। একথা বর্ত্তমানে সর্ব্ববাদসম্মত বলিলেও বলিতে পারি। ভগবানের একই মঙ্গল ইচ্ছা ফলে ফুলে একভাবে বিকশিত হইতেছে, নদীতে সাগরে আর একভাবে পরিস্ফুট হইতেছে; আবার সূর্য্যচন্দ্রে গ্রহনক্ষত্রে উহা আর এক নবীনতর আকারে প্রকাশ পাইতেছে। প্রকৃতি যখন সেই মঙ্গলময়ের মঙ্গল ইচ্ছার ছাপ লইয়াই অভিব্যক্ত হইয়াছে, তখন সেই প্রকৃতির ভিত্তিতে রচিত আর্টেরও সর্ব্বাঙ্গে মঙ্গলভাবের ছাপ যে ফেলিতে হইবে তাহাতে সন্দেহ কি?

কিন্তু যাঁহারা আর্টের খাতিরে আর্ট বা প্রত্যক্ষদ্যোতক আর্ট প্রভৃতি ধুয়ার দোহাই দেন, তাঁহারা উপরোক্ত কথার প্রত্যুত্তরে বলিতে পারেন জানি যে, প্রকৃতিতে অমঙ্গলেরও তো ছাপ দেখা যায়, তবে কোন কোন স্থলে অমঙ্গলকেই বা আর্টের ভিত্তি করিতে আপত্তি কি? আপত্তি যথেষ্টই আছে। প্রকৃতি-রাজ্যে আপাতত যাহা অমঙ্গল বলিয়া প্রতীয়মান হয়, ভগবৎ-বিধানে তাহাও অদূর ভবিষ্যতে পরিণামে মঙ্গলপ্রসূ হয় দেখা যায়। কিন্তু মানুষ আর্টের দোহাই দিয়া তাহার ভিত্তিস্বরূপে

যে অমঙ্গলের ভাবকে স্থায়িত্বপ্রদানে অগ্রসর হয়েন, ভগবৎ-বিধানে তাহাও অবশ্য পরিণামে মঙ্গলপ্রসূ হইবেই—কিন্তু এক তো তাহা অধিকাংশস্থলেই সুদূর ভবিষ্যতে হয়; দ্বিতীয়ত মঙ্গলপ্রসূ হইবার পূর্ব্বে তাহা মানবসমাজের অঙ্গ অনেকটা ক্ষতবিক্ষত করিয়া দেয়।

নিছক্ আর্টের দোহাই যাঁহারা দেন, তাঁহারাও যখন প্রকৃতিকে অতিক্রম করিয়া চলিতে পারেন না—প্রকৃতির সঙ্গে আর্টের যখন একতানে ঝঙ্কার দিতেই হইবে, তখন দেখা যাক, প্রকৃতিই বা কি ভাবে আমাদের অন্তরে আর্ট জাগাইয়া তুলেন। একজন যদি Jack the Ripperএর ন্যায় অপর কাহাকেও সুনিপুণভাবে হত্যা করে, তাহার ভিতর বধসাধনের আর্ট বা অস্ত্রাঘাতের কলাকৌশল যে কিছুমাত্র পাওয়া যাইবে না, তাহা বলিতে পারি না। কিন্তু সেই আর্টের ধারা এত ক্ষীণ ও নিম্ন-স্তরের যে, তাহাকে কেহই প্রকৃত আর্ট বলিতে পারে না এবং বলেও না। সেই অস্ত্রাঘাতের বর্ণনাও যতই কেন সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম হউক না, তাহা প্রকৃত আর্টের পদবীতে কিছুতেই উঠিতে পারে বলিয়া মনে করি না। কোন চিত্রকর যদি বমনের ন্যক্কার-জনক চিত্র সূক্ষ্মভাবে অঙ্কিত করিয়া আমাদের সম্মুখে ধারণ করেন, তাহাকে নিশ্চয়ই কেহই একটা মস্ত আর্টের বস্তু, উপভোগের বস্তু বলিয়া স্বীকার করিবে না। এই সকল চিত্রে আর্টের ছায়া থাকিলেও তাহা দ্বারা প্রকৃত আর্টের যে গৌরব-

বৃদ্ধি হয় না, তাহা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবে না। এই সকল ঘটনার মধ্যে বাস্তবিকই আর্টের ধারা অত্যন্ত ক্ষীণ, এই কারণেই প্রকৃতিতে অন্যান্য মঙ্গলজনক ও জগতের উন্নতি-সাধক ঘটনার তুলনায় এই সকল ঘটনা অনেক বিরল। আবার প্রকৃতির ব্যবস্থাও এমন যে, প্রকৃতি স্বয়ং ঐপ্রকার আর্টের বহির্ভূত উপভোগের অযোগ্য ঘটনাসমূহ হইতে আমাদের দূরে সরিয়া থাকিবার প্রবৃত্তি দেন। ইহা হইতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, এইপ্রকার অমঙ্গলজনক ও ঘৃণ্য ঘটনায় আমরা যে আর্টের সন্ধানে প্রবৃত্ত হই, প্রকৃতি তাহা ইচ্ছা করেন না, সেই আর্ট সন্ধানের যেন অবসরই দিতে চাহেন না। চেষ্টা করিলে মৃত্যু হইতেও যে আর্ট পাওয়া যায় না তাহা নহে। কিন্তু সাধারণত মৃত্যু হইতে আর্ট বাহির করিবার অবসর দেওয়া প্রকৃতির ইচ্ছা নয় বলিয়াই মনে হয়। তাই মৃত্যুকালে দর্শকের মন অবসাদে এত অভিভূত হইয়া পড়ে; তদ্ব্যতীত, সমস্ত জীবনের মধ্যে মৃত্যু মাত্র একমুহূর্ত্তের জন্য উপস্থিত হয়, এবং তাহার তুলনায় প্রকৃতি জীবনের খেলা খেলিবার জন্য আমাদিগকে অনেক দীর্ঘ অবসর প্রদান করেন। যে জীবন উন্নতির অভিমুখে চলিতে চলিতে বিচিত্র ভঙ্গীতে আনন্দে নৃত্য করিতে থাকে, সেই জীবনসম্বন্ধীয় আর্টই প্রকৃত আর্টরূপে আমাদের সম্মুখে ধারণ করা প্রকৃতির অভিপ্রেত বলিয়া সেই আর্টই আমাদের বড়ই প্রাণস্পর্শী হয়।

প্রকৃতি আমাদের কল্পনাকে, আমাদের চিন্তা প্রভৃতিকে উন্নতির অভিমুখে লইয়া চলিবার জন্য যে সকল বিষয় আমাদের সম্মুখে নিয়ত উন্মুক্ত রাখিয়া তাহাদের মধ্য হইতে আর্ট উপভোগের প্রবৃত্তি আমাদের অন্তরে সর্ব্বদাই জাগ্রত করিয়া তুলেন, তাহা হইতেই আমরা অনায়াসে বুঝিতে পারি যে, আর্টের জন্য কোন্ প্রকার বিষয় আমাদের আদর্শ গ্রহণ করা প্রকৃতির অভিপ্রেত। প্রচণ্ড গ্রীষ্ম ভেদ করিয়াও যখন গ্রীষ্মকালের সন্ধ্যাকালে সুবিমল আকাশে তারাগুলি একে-একে ফুটিয়া উঠে এবং আকাশের চন্দ্রাতপকে যখন মলয়বায়ু মৃদুমন্দ হিল্লোলে ধীর-বিকম্পিত করিতে থাকে,—প্রকৃতির সেই আর্ট যিনি উপভোগ করিয়াছেন, তিনি কি কখনও বীভৎস অশ্লীল বিষয়ের আর্ট উপভোগ করিতে পারেন? "ভরা বাদলের" সন্ধ্যার ঠিক পূর্ব্বক্ষণে পূর্ব্বদিকে বারিবিন্দুসকল যখন বিচিত্র ইন্দ্রধনু অঙ্কিত করে; বারিবিন্দুগুলি যখন আকাশে বাতাসে ঝিকিমিকি কাঁপিতে থাকে, সেই সময়ে প্রকৃতির আর্ট দেখিয়া মানবহৃদয় যে কোথায়—কোন্ সুরপুরে চলিয়া যায়, তাহা কে জানে? শরতের পৌর্ণমাসীতে চাঁদের মুখের উপর দিয়া একখণ্ড সাদা মেঘ যখন হাসিতে হাসিতে ভাসিয়া যায়, চাঁদেতে মেঘেতে যখন ক্রমাগত লুকোচুরি খেলা চলিতে থাকে, তখন সমস্ত ধরণীর বুকের ভিতরে কি এক আশ্চর্য্য পুলকই না জাগিয়া উঠে! যখন সমুদ্রের সুস্থির-তরঙ্গিত জলের ভিতর একদিকে

অস্তাচলে ঢলিয়া-পড়া সান্ধ্যতপন, আর অপরদিকে উদীয়মান পূর্ণচন্দ্র মানবকে মন্ত্রমুগ্ধ করিবার নিজ নিজ শক্তি পরীক্ষা করিতে থাকে, সে আর্টের তুলনা কোথায়? সন্ধ্যাকালে পল্লীগ্রামে ঝিঁঝিঁ পোকার মুখরিত রসনচৌকী-বাদ্য যিনি শুনিয়াছেন এবং অমানিশার ঘোর অন্ধকারের ভিতর জোনাকিপোকার ঝিকিমিকি খেলা যিনি দেখিয়াছেন, প্রকৃতি নিশ্চয়ই তাঁহার প্রাণের ভিতর নিজের অপূর্ব্ব আর্টের লীলা চিরকালের জন্য জাগাইয়া রাখিবেন।

প্রকৃতি যখন সাধারণত এই ভাবেই মানুষকে উন্নতভাবের প্রতি আকর্ষণ করিয়া, উন্নতির দিকে লইয়া গিয়া প্রতি-নিয়তই নিজের উন্নত ও মঙ্গলসাধক আর্টই শিক্ষা দিতে উদ্যুক্ত, তখন উন্নতিসাধক আর্টই যে প্রকৃত আর্ট, সে বিষয়ে কোন সন্দেহই থাকিতে পারে না। বীভৎস, অশ্লীল প্রভৃতি বিষয় আমাদের ইন্দ্রিয়গোচর হইলে আমাদের ন্যক্কার আসিতে পারে, আমাদের কামভাব জাগ্রত হইতে পারে, কিন্তু তাহা হইতে প্রকৃত আর্টের তত্ত্ব কিছুতেই আমাদের উপলব্ধিতে আসিতে পারে না। প্রকৃত আর্ট হইতে যে ধীর স্থির উপভোগের ভাব আসে, সে উপভোগ এবং সে শান্তি আমরা ঐ সকল ন্যক্কারজনক বা কামোদ্দীপক বিষয় হইতে পাই না। ইহা হইতেই প্রমাণিত হইতেছে যে, যে সকল বিষয় আমাদের অন্তরে অস্বাস্থ্যের ভাব লইয়া আসে, অথবা আমাদিগকে

অমঙ্গল ও অশান্তির পথে লইয়া যায়, সেই সকল বিষয়ের মধ্যে প্রকৃত আর্টের অস্তিত্ব থাকে না, আর থাকিলেও তাহা খুবই নিম্নস্তরের।

উন্নতিসাধক বিষয়ের মধ্যে আর্টের সন্ধান করিবে, অথবা অবনতিসাধক বিষয়ের মধ্যে করিবে, তাহা আর্টিষ্টের বা শিল্পীর মনের উপর অনেকটা নির্ভর করে। প্রকৃতিতে স্বর্গীয় দৃশ্যও আকাশে বিছানো আছে, আবার এই পৃথিবীতে বীভৎস ও অশ্লীল দৃশ্যও অনেক আছে। তাহার মধ্যে আর্টিষ্ট নিজের আর্ট প্রকাশ করিবার জন্য কোন্ দৃশ্য গ্রহণ করিবেন, তাহা তাঁহার নিজের মনের উপরেই নির্ভর করিবে। হীরকের ক্ষেত্রে গিয়া আমি যদি হীরকের পরিবর্ত্তে কয়লাই তুলিয়া লই, অথবা একটা সামান্য স্ফটিক পাথরকেই হীরকভ্রমে তুলিয়া লইয়া আহ্লাদে নৃত্য করিতে থাকি, তাহাতে হীরকের দোষ হইবে না, তাহাতে আমারই বুদ্ধির দোষ ধরা পড়িবে। আমি যদি ভাল জহুরি হই, তবেই আমি ভাল "জলের" হীরক বাছিয়া লইয়া তাহাই কাটিয়া ঘষিয়া তাহার "জল" বাহির করিয়া নিজের কৃতিত্ব দেখাইতে পারিব। সদারঙ্গের ধ্রুপদ বা তেলেনাও গান, আবার গ্রামোফোনের "চিংড়িতে কপিতে যদি মিতে হয়" ইহাও একটা গান। কিন্তু কোন্ গান আমার ভাল লাগিবে, কোন্ গানে আমি বাহাদুরী দেখাইব, তাহা আমার প্রকৃতির উপর, আমার রসবোধের উপর সম্পূর্ণই নির্ভর

করিবে। সেই প্রকার উপন্যাসে এবং সাহিত্যের অন্যান্য অনুরূপ ক্ষেত্রে তুমি ব্যভিচার লাম্পট্য প্রভৃতির ভিতরে আর্ট খুঁজিবে, ঐ সকলের ভিতর দিয়া আর্ট ব্যক্ত করিবে; অথবা যে সতীত্ব ভারতললনাকে জহরব্রত আলিঙ্গনে অগ্রসর করিয়া দিয়াছিল, যে বীরত্ব যে ধর্ম্মপ্রাণতা প্রাচীন ভারতকে আজও জগতের নমস্য করিয়া রাখিয়াছে, তাহার ভিতরে আর্ট খুঁজিবে, সেই সকলের ভিতর দিয়া আর্ট ব্যক্ত করিবে, তাহা সম্পূর্ণরূপে তোমার প্রকৃতির উপরেই নির্ভর করিবে।

ইতি শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর কথিত "আর্ট ও সাহিত্য" কথায় আর্ট ও প্রকৃতি বিষয়ক অষ্টম কথা সমাপ্ত।

ওঁ

নবম কথা—আর্ট ও তাহার অঙ্গত্রয়।

আমরা নানা দিক হইতে আলোচনা করিয়া আর্ট সম্বন্ধীয় তিনটী মূল মন্ত্রকে আর্টের অপরিহার্য্য অঙ্গরূপে প্রাপ্ত হইয়াছি—(১) আর্টের ভিত্তি সত্য প্রকৃতি এবং স্বাভাবিকতাই আর্টের প্রাণ; (২) মঙ্গলভাব আর্টের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এবং ভগবান আর্টের কেন্দ্র; এবং (৩) সৌন্দর্য্য আর্টের বহিঃপরিচ্ছদ। আমরা এই কয়টী অঙ্গ পৃথকভাবে আলোচনা করিয়া আসিয়াছি, এক্ষণে ঐ তিনটী অঙ্গের বিষয় একত্রভাবে আলোচনা করিব—তাহা হইলে আমাদের বক্তব্য হৃদয়ে ধারণা করিবার সুবিধা হইবে। ঐ তিনটী অঙ্গকে আমরা মূলতত্ত্ব বা মূলমন্ত্ররূপে উল্লেখ করিব, কারণ উহারা প্রকৃতই আর্টের মূল তত্ত্ব বা মূলমন্ত্র।

এই তিনটী অঙ্গ প্রত্যেক আর্টের বস্তুতে পাইতেই হইবে। কিন্তু একটু গভীরভাবে তলাইয়া আলোচনা না করিলে চিত্রে, ভাস্কর্য্যে, এমন কি সঙ্গীত প্রভৃতিতেও এই অঙ্গত্রয়ের অস্তিত্ব সহজে সম্যকরূপে উপলব্ধ হইবে না। সাহিত্যক্ষেত্রের কয়েকটী বিভাগে, বিশেষত উপন্যাসবিভাগে আর্টের এই মূলতত্ত্ব কয়টী সহজে ও সুস্পষ্টরূপে হৃদয়ঙ্গম করিবার অবসর পাওয়া যায়। তাই আমরা আর্টের এই অঙ্গত্রয়ের আলোচনাসূত্রে সাহিত্য-ক্ষেত্রের উপন্যাসবিভাগ লইয়াই কিছু নাড়াচাড়া করিব স্থির করিয়াছি। উপন্যাস অবলম্বনে আমাদের বক্তব্যগুলি হৃদয়ঙ্গম

করিতে পারিলে সাহিত্যের অপরাপর বিভাগেও এবং চিত্র সঙ্গীত প্রভৃতিতেও ঐ মূলতত্ত্বগুলির উপযোগ করা সহজ হইবে। বলা বাহুল্য যে, বর্ত্তমান ক্ষুদ্র গ্রন্থে সাহিত্যের অপরাপর বিভাগে বা চিত্রাদিতে ঐ অঙ্গত্রয়ের উপযোগ পৃথকভাবে আলোচনা করিবার অবসর ও স্থানের অত্যন্ত অভাব।

আর্টের উপরোক্ত অঙ্গত্রয়কে মোটামুটি দুই ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে—অন্তরঙ্গ ও বহিরঙ্গ, বাহিরের সহিত যেগুলির প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ, যেগুলির অভাবে আর্টের বাহিরে ব্যক্ত হওয়া বা আপনাকে প্রকাশ করা অসম্ভব, সেইগুলিকে আমরা আর্টের বহিরঙ্গ বলিয়া ধরিব, এবং অবশিষ্টগুলিকে আর্টের অন্তরঙ্গ বলিয়া ধরিব।

উপরোক্ত অঙ্গত্রয়ের মধ্যে প্রথম ও তৃতীয়, এই দুইটী অঙ্গকে আর্টের বহিরঙ্গ বলিয়া ধরিতে পারি, কারণ ঐ দুইটা অঙ্গ না থাকিলে আর্ট বাহিরে ব্যক্তই হইতে পারে না। কাজেই আমরা দ্বিতীয় অঙ্গটীকেই আর্টের অন্তরঙ্গ বলিয়া ধরিব। প্রথমে আমরা এই অন্তরঙ্গের সম্বন্ধেই আলোচনা করিয়া দেখিব। ইতিপূর্ব্বে এই মন্ত্রসম্বন্ধে অনেক কথা বলিয়া আসিলেও এখানে আরও দুই একটা কথা বলিবার সঙ্কল্প করিয়াছি। এই অন্তরঙ্গ মন্ত্রটা দুই অনুমন্ত্রে বিভক্ত করা যাইতে পারে—(ক) ভগবান আর্টের কেন্দ্র এবং (খ) মঙ্গলভাব আর্টের লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য। উভয়েই পরস্পর-সাপেক্ষ, পরস্পর পরস্পরের উপর বলিতে গেলে অবলম্বিত।

আমরা গ্রন্থের বিভিন্ন প্রবন্ধে, বিশেষতঃ সর্ব্বপ্রথম "আর্ট ও সত্য" প্রবন্ধে যাহা বলিয়া আসিয়াছি, তাহা আলোচনা করিলে বোধ হয় আর কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবে না যে, কোন আর্ট ভগবানকে সম্পূর্ণ ছাড়িয়া দাঁড়াইতে পারে না। সত্য যখন আর্টের ভিত্তি, প্রকৃতি যখন আর্টের আশ্রয়, তখন সেই সত্যের মূল, সেই প্রকৃতির অধিষ্ঠাত্রী দেবতা ভগবানকে সম্পূর্ণ ছাড়িলে আর্ট কি প্রকারে দাঁড়াইতে পারে? প্রত্যক্ষভাবে বা পরোক্ষভাবে, স্পষ্টরূপে বা অস্পষ্টরূপে আর্টমাত্রেরই কেন্দ্রে ভগবানকে রাখিতে হইবেই।

ভগবানকে আর্টের কেন্দ্রে রাখিলেই, স্বভাবত মঙ্গলভাবকেও আর্টের উদ্দেশ্য করিয়া রাখিতেই হইবে। কোন আর্টই, তাহা দ্বারা জগতের কেবল অমঙ্গলই হউক, এই ভাব লইয়া নামিতেই পারে না। আর্টিষ্ট মাত্রেরই উদ্দেশ্য থাকে যে, তাঁহার আর্টের দ্বারা লোকদিগের আর কিছু হউক বা না হউক, অন্তত আনন্দটুকু হউক—তাঁহার আর্ট দেখিয়া একটু সুখও হউক। এই সুখই মঙ্গলভাবের একটা দিক। কাজেই সপ্রমাণ হইতেছে যে, কোন আর্ট মঙ্গলভাবকে সম্পূর্ণ বিসর্জ্জন দিয়া দাঁড়াইতে পারে না—যেমন আর্টের কেন্দ্রে ভগবানকে রাখিতে হইবে, সেইরূপ সম্পূর্ণভাবে হউক বা আংশিকভাবে হউক, প্রত্যক্ষভাবে হউক বা পরোক্ষভাবে হউক, স্পষ্টরূপে হউক বা অস্পষ্টরূপে হউক, মঙ্গলভাবকেও আর্টমাত্রেরই লক্ষ্য

বা উদ্দেশ্য রাখিতে হইবেই। তবে আমরা যখন বলি যে, মঙ্গলভাবকে আর্টের লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য রাখা উচিত, তাহার অর্থ এই যে, আমরা চাহি যে, প্রত্যক্ষভাবে, সম্ভবমত সম্পূর্ণ ও স্পষ্টভাবে মঙ্গলভাবকে আর্টের উদ্দেশ্য রাখিতে হইবে।

আর্টের অন্তরঙ্গ এই মন্ত্রটীকে আর্টের মধ্যে স্পষ্টভাবে উপস্থিত না করিলেও আর্ট ব্যক্ত হইবার পক্ষে বিশেষ কোন ব্যাঘাত ঘটে না। যেমন কোন একটা মূর্ত্তির ভিতরটা ফাঁপা করিয়াই গঠিত হউক অথবা বিভিন্ন বস্তু দ্বারা পূর্ণ করিয়া নীরেটভাবেই গঠিত হউক, তাহাতে সেই মূর্ত্তির বহিঃপ্রকাশের পক্ষে বিশেষ কোন ব্যাঘাত ঘটে না—কেবল সেই মূর্ত্তির অন্তর পরীক্ষা করিতে যে চাহিবে, সে-ই জানিতে পারিবে যে, মূর্ত্তিটী ফাঁপা অথবা নীরেট; সেইরূপ ভগবানকে কোন আর্টের কেন্দ্রে রাখা হইয়াছে কি না, এবং জগতের উন্নতি ও মঙ্গল তাহার লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য করা হইয়াছে কি না, যে সেই আর্টের মধ্যে প্রবেশ করিয়া উহা অনুসন্ধান করিবে, সে-ই তাহা বুঝিতে পারিবে—কিন্তু এই দুইটী অন্তরঙ্গ অনুমন্ত্রের ন্যূনাধিক অভাব ঘটিলেও আর্টের ব্যক্ত আকারে বহিঃপ্রকাশের পক্ষে কোনই ব্যাঘাত হইবে বলিয়া মনে হয় না। তবে এবিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই যে, এই অন্তরঙ্গের অভাবের মাত্রা অনুসারে আর্টও তদনুপাতে সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে।

উপরোক্ত অঙ্গত্রয়ের মধ্যে প্রথম ও তৃতীয়টীই আর্টের বহিঃ-

প্রকাশের অপরিহার্য্য অঙ্গ—এই দুইটীর সঙ্গে আর্টের ব্যক্ত আকার ধারণ করিবার অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ। তন্মধ্যে প্রথম অঙ্গ বা মন্ত্রেও আমরা দুই অনুমন্ত্রের সমাবেশ করিতে পারি—(ক) প্রকৃতিই আর্টের ভিত্তি এবং (খ) স্বাভাবিকতাই আর্টের প্রাণ। এই দুইটী অনুমন্ত্রও এতই পরস্পরসাপেক্ষ যে, একটীকে ছাড়িলে অপরটীর কোনই সার্থকতা থাকে না। তাই আমরা ঐ দুইটী অনুমন্ত্রকে একটী মন্ত্রে সন্নিবদ্ধ করিয়া রাখিতে চাহি। আমরা গ্রন্থের বিভিন্ন স্থলে আলোচনা করিয়া দেখিয়াছি যে, সত্য-প্রকৃতির ভিত্তি ব্যতীত আর্ট দাঁড়াইতেই পারে না অর্থাৎ আত্মপ্রকাশই করিতে পারে না। প্রকৃতির বাহিরে গিয়া আর্ট ব্যক্ত আকার ধারণ করিবে কি প্রকারে? আর্টিষ্ট নিজেই যে প্রকৃতির ভিতরে—একমাত্র প্রকৃতির অধীশ্বর ও নিয়ন্তা ভগবানই প্রকৃতির অতীত হইতে পারেন। আর্টিষ্টকে প্রকৃতির ভিতর হইতেই, প্রকৃতিকে অনুকরণ ও অনুসরণ করিয়াই আর্টের উপকরণ সংগ্রহ করিতে হইবে, এবং সেই উপকরণের সাহায্যেই তাঁহার আর্টকে পরিস্ফুট করিয়া তুলিতে হইবে।

প্রকৃতিকে অনুসরণ করিয়াই যদি আর্টকে দাঁড়াইতে হয়, তবে স্বাভাবিকতা যে আর্টের প্রাণ, তাহা তো স্বতঃসিদ্ধরূপেই দাঁড়ায়। সাধারণতঃ প্রকৃতির আনুগত্যকেই তো, প্রকৃতির বিরুদ্ধে না গিয়া তাহার সপক্ষে চলাকেই তো আমরা স্বাভাবিকতা বলি। সুতরাং প্রকৃতিকে আর্টের ভিত্তিরূপে রাখিতে

হইলে প্রকৃতিসিদ্ধ যাহা, স্বভাবসিদ্ধ বা স্বাভাবিক যাহা, তাহা-কেই যে আর্টের প্রাণরূপে রাখিতে হইবে, তাহা বলা বাহুল্য। এখন, প্রকৃতির বিভিন্নদেশে ও বিভিন্নকালে বিভিন্নভাবে বিকাশ দেখা যায়। কাজেই আর্টের প্রাণ বজায় রাখিতে চাহিলে, আর্টকে স্বাভাবিক করিতে চাহিলে সেই বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন কালের প্রাকৃতিক ভাবই ফুটাইয়া তুলিতে হইবে। স্থান কাল ও অবস্থা অনুযায়ী যথাযোগ্য ভাব ফুটাইয়া তুলিতে না পারিলে চিত্র অস্বাভাবিক হইয়া উঠিবে, তাহাতে আর্টের প্রাণেরই অভাব হইবে—বালির বাঁধের উপর গৃহনির্ম্মাণ হইবে; তাহাতে মঙ্গলভাব, সৌন্দর্য্য প্রভৃতি সুরক্ষিত করিবার চেষ্টা সম্পূর্ণই ব্যর্থ হইবে। যে পরিমাণে আর্টকে স্বাভাবিক ভাব ও অবস্থার ভিতর দিয়া ব্যক্ত করিবার চেষ্টা হইবে, সেই পরিমাণেই তাহার সাফল্যলাভের সম্ভাবনা আছে; তদ্বিপরীতে অস্বাভাবিকতার ভিতর দিয়া ব্যক্ত করিবার চেষ্টা করিলে তাহা নিষ্ফল ও ব্যর্থ হইবার সম্ভাবনা নিশ্চিত।

আর্টের তৃতীয় অপরিহার্য্য অঙ্গ হইল সৌন্দর্য্য। যেমন উৎসবে যোগদানের জন্য আত্মপ্রকাশ করিতে গেলে সুন্দর পরিচ্ছদ পরিতে হয়, সেইরূপ আর্টেরও বহিঃপ্রকাশের বা আপনাকে ব্যক্ত করিবার অন্যতর অপরিহার্য্য উপায় হইল তাহার সৌন্দর্য্য। আমরা ইতিপূর্ব্বে বলিয়া আসিয়াছি যে, আর্টের সঙ্গে সৌন্দর্য্যের এতই ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ যে, জনসাধারণের

অনেকেই এই বহিঃসৌন্দর্য্যমাত্রকেই অনেক সময়ে আর্ট মনে করিয়া ভুল করে। পশ্চিমাঞ্চলে একপ্রকার কাপড়ের পুতুল নির্ম্মিত হয়—তাহার মাথাটুকুই বাহিরে থাকে আর সেই মাথা হইতে একটা রংচঙ্গা কাপড় ঝুলাইয়া দেওয়া হয়। ক্রেতারা সেই কাপড়ের ভাঁজভঙ্গী দেখিয়া কল্পনায় তাহাকে সমগ্র পুতুল বলিয়াই গ্রহণ করে; তাহারা দেখে না যে, কাপড়ের ভিতরে আসলে কিছুই নাই। সেইপ্রকার আজকাল সাহিত্যে অস্বাভাবিকতার উপরে দাঁড়-করানো প্রাণহীন আর্টকে শব্দের আড়ম্বর প্রভৃতি নানাবিধ বহিঃপরিচ্ছদে আচ্ছাদিত করিয়া প্রকৃত আর্ট বলিয়া চালাইবার চেষ্টা হয় বটে, কিন্তু প্রকৃত আর্টের জহুরি, পাকা আর্টিষ্ট তাহাতে প্রতারিত হন না। অবশ্য এ কথা অস্বীকার করা যায় না যে, আর্টের বস্তুতে আর্টের অন্যান্য অঙ্গের সমাবেশ থাকিলেও সৌন্দর্য্যের অভাব হইলে তাহার আর্ট সহজে জনসাধারণের উপলব্ধিতে আসে না।

এই সৌন্দর্য্যবিকাশের ধারা বিভিন্ন দেশের ও বিভিন্ন কালের প্রকৃতি অনুসারে বিভিন্ন হয় বটে, কিন্তু তাহার মূলভাবগুলি সকল দেশে, সকল কালে ও সকল অবস্থায় সমান। যে প্রকৃতিকে অতিক্রম করিয়া প্রকৃত আর্টিষ্ট একপদও চলিতে পারেন না, এবং যে প্রকৃতিরই সৌন্দর্য্য প্রকৃতিরই অনুসরণে একটু হের-ফের করিয়া আর্টিষ্ট নিজের আর্টকে সুব্যক্ত করিয়া তুলিতে চাহেন, সেই প্রকৃতিরও মূল তত্ত্বগুলি অবস্থাবিশেষে বিভিন্ন

আকার ধারণ করিলেও যখন মূলত সর্ব্বত্রই এক, :তখন সৌন্দর্য্যও অবস্থাবিশেষে বিভিন্ন আকারে আত্মপ্রকাশ করিলেও তাহার মূলভাবগুলি অবস্থানির্ব্বিশেষে সর্ব্বত্রই এক ও সমভাবে দণ্ডায়মান। সৌন্দর্য্য-বিকাশের মূলভাবগুলি যে কি, এই ক্ষুদ্র গ্রন্থে সেগুলি বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করা অসম্ভব। তবে মোটামুটি এইটুকু বলিতে পারি যে, প্রকৃতির মধ্যে যে সৌন্দর্য্য প্রাণেতে উপলব্ধি করিব, স্বাধীনভাবে ও সরলভাবে, ঘোর-পেঁচালো কায়দা-কারদানি ছাড়িয়া দিয়া, তাহাকে অন্তরের উপলব্ধির সহিত মিলাইয়া ব্যক্ত করাই হইল সৌন্দর্য্যবিকাশের সর্ব্বপ্রধান মূলভাব। প্রকৃতির সৌন্দর্য্যকে অন্তরে উপলব্ধি না করিলে কিছুতেই সৌন্দর্য্য বিকশিত করিতে পারা যায় না। সাহিত্যের সৌন্দর্য্য হইল ছন্দ প্রভৃতি। তাই সাহিত্যে সৌন্দর্য্যসাধন করিতে গেলে প্রকৃতির ছন্দ প্রভৃতি অন্তরে উপলব্ধি করিতে হইবে। প্রকৃতির ছন্দ প্রভৃতি সৌন্দর্য্যের উপকরণ উপলব্ধি করিতে না পারিলেও আমরা সাহিত্যে বা চিত্রে বা কোন কিছুতেই সৌন্দর্য্যের পরিচ্ছদ দিতে পারিব বলিয়া মনে হয় না।

আজকাল নিজের বক্তব্যকে আর্টের নামে খুব ঘোরালো-পেঁচালো করিয়া ব্যক্ত করিবার একটা ধুয়া উঠিয়াছে। অনেক সময়ে এমনও দেখা গিয়াছে যে, বলিবার প্রণালী এতই বক্রভাব ধারণ করে যে, আর্টিষ্ট কিছুদিন বাদে নিজেই খুঁজিয়া পান না

যে, তিনি কি ভাবে কি অর্থে কোন্ কথা বলিয়াছিলেন। এইভাবে বাঁকাইয়া কথা বলাকে যাঁহার ইচ্ছা তিনি আর্ট বলিতে পারেন বা সুন্দর বলিতে পারেন, কিন্তু প্রসঙ্গবিশেষ ভিন্ন সাধারণত আমরা তাহাকে কিছুতেই আর্টও বলিতে পারি না, সুন্দরও বলিতে পারি না। আমি সভামাঝে উপবিষ্ট, এমন সময়ে আমার নাসাগ্রে একটী মক্ষিকা বসিল। আমি সহজভাবে শোভনভাবে সেই মক্ষিকাটী যদি তাড়াইয়া দিই, তাহা সুন্দর হইবে? না, আমি যদি সেই মক্ষিকাটী তাড়াইবার জন্য পৃষ্ঠের উপর দিয়া, মস্তকের পশ্চাৎ হইতে হাত ঘুরাইয়া আনিয়া শরীরটাকে দুমড়াইয়া একটা কিম্ভূতকিমাকার করিয়া তুলি, তাহা সুন্দর হইবে? প্রকৃত আর্ট যাহা, প্রকৃত সুন্দর যাহা, তাহা আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেরই প্রাণকে মুগ্ধ করিবে, সকলেরই প্রাণে সাড়া পাইবে, ঝঙ্কার দিয়া উঠিবে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। কোথায় কোন্ যুগে, লক্ষ লক্ষ বৎসর পূর্ব্বে কোন্ অসভ্য মানব দুইটী হরিণের লড়াই আঁকিয়াছিল, আজ লক্ষ লক্ষ বৎসর পরে তাহার সৌন্দর্য্য, তাহার আর্ট আমরাও শতমুখে প্রশংসা করিতেছি। যাহা সহজে বুঝা যাইবে না তাহাকেই যদি আর্ট বলিয়া স্বীকার করিতে হয়, তবে তাহাতে আমাদের বুদ্ধিবৃত্তিকেই প্রকারান্তরে ধিক্কার দেওয়া হয়।

স্বভাবকে বিকৃত না করিলে প্রকৃতির মধ্যে ভাল যাহা,

সুন্দর যাহা, তাহা আমাদেরও অন্তরে সৌন্দর্য্য প্রতিফলিত করিয়া তুলে, প্রকৃত আর্ট উপভোগ করিবার শক্তিকে জাগ্রত করিয়া দেয়। শরতের প্রভাতের শত দীপ্ত বর্ণে অনুরঞ্জিত আকাশ এবং মৃদু মন্দ বায়ু কাহার না প্রাণে আর্ট ও সৌন্দর্য্য জাগাইয়া তুলে? কাহার প্রাণ তখন রুদ্ধ গৃহে আবদ্ধ থাকিতে চায়? কিন্তু এমন আকাশ, এমন বাতাসও ম্যালেরিয়া-রোগীর নিকটে যে নরকসদৃশ অনুভূত হয়, তাহা সকলেই জানে। টাটকা ফল, টাটকা খাদ্য কাহার না ভাল লাগে? কিন্তু যাহারা স্বভাবকে বিকৃত করিয়া ফেলে, তাহাদেরই নিকটে অনেক সময়ে টাটকা ফল প্রভৃতি অপেক্ষা সুঁটকি মাছ, জাতকীট পচা মাংস ও পনির, এমন কি, খাদ্য পচাইয়া যে কীট নির্গত হয়, সেই কীটও উপাদেয় বোধ হয়! সেইরূপ রুচির বিকৃতি না ঘটিলে, সাহিত্যে বা উপন্যাসে যে সকল বিষয় আমাদের উন্নত ভাবকে পরিপুষ্ট করিতে পারে, আমাদের সাধুভাবের সঙ্গে সায় পায়, সেই সকল বিষয়েরই ভিতরে প্রকৃত আর্ট ও সৌন্দর্য্য পাইবার কথা। সেই সকল ভাবের উপর দাঁড়াইলেই আমাদের বক্তব্যে সৌন্দর্য্য স্বতঃই ফুটিয়া উঠিতে চাহে।

কাজেই দেখা যাইতেছে যে, বিষয়নির্ব্বাচনের উপর এবং নির্ব্বাচিত বিষয়কে উপযুক্ত ভাবে ফুটাইয়া তুলিবার উপরে অনেক সময়ে আর্ট ও সৌন্দর্য্য পরিস্ফুট হওয়া না-হওয়া নির্ভর করে। আবার এই বিষয়নির্ব্বাচন ও বিষয়টীকে ফুটাইয়া

তোলা অনেক সময়েই আর্টিষ্টের ব্যক্তিগত প্রকৃতির উপর নির্ভর করে। সুতরাং প্রকারান্তরে বলা যায় যে, আর্টিষ্টেরই ব্যক্তিগত প্রকৃতির উপরে আর্ট ও সৌন্দর্য্য ভালরূপ ব্যক্ত হওয়া না-হওয়া অনেক পরিমাণে নির্ভর করে।

আর্ট ও সৌন্দর্য্যের এই ভিতরকার কথা না বুঝিয়া অনেক সাহিত্যিক, মানুষের মনের আস্তাকুঁড় হইতে কতকগুলি অশ্লীল ও ন্যক্কারজনক মনোবৃত্তি বাছিয়া লইয়া তাহাদের উপরে শব্দালঙ্কার প্রভৃতি কতক গুলি ঝকঝকে পরিচ্ছদ চাপাইয়া সেই-গুলিকে তাঁহাদের নবাবিষ্কৃত আশ্চর্য্য মনস্তত্ত্বের চিত্ররূপে জগতের সম্মুখে দাঁড় করাইতে চাহেন; এবং জনসাধারণকে কিনা জানি না, অন্তত শিক্ষিতসমাজকে বুঝাইতে চাহেন যে, সেই সকল শব্দালঙ্কারে আবৃত মনোবৃত্তির চিত্রের ভিতর দিয়া আর্ট ও সৌন্দর্য্য একেবারে ঝলকে ঝলকে বাহির হইয়া পড়িতেছে। জনসাধারণ বা শিক্ষিতসমাজ তাহার মধ্যে আর্টের বিন্দুকণাও দেখিতে পান বা না-ই পান, যখন তাঁহারা দেখেন যে, দেশের মধ্যে যাঁহারা ধনে মানে জ্ঞানে খ্যাতিতে শ্রেষ্ঠ, তাঁহারা নিজেই এইরূপ অশ্লীল ও বীভৎস চিত্র অঙ্কিত করিতেছেন, এবং তাঁহারাই এই প্রকার রচনাকে আর্ট ও সৌন্দর্য্যে ঢলঢল বলিয়া স্বীকার করিতেছেন, তখন তাঁহারাই বা তাহা অস্বীকার করেন কিরূপে? তাঁহারা ঐ সকল চিত্রে ও রচনায় আর্ট ও সৌন্দর্য্যের চিহ্নমাত্র উপলব্ধি করিতে

না পারিলেও সে কথা মুখ ফুটিয়া বলিতে সাহস করেন না, পাছে তাঁহারা আর্টে অনভিজ্ঞ বলিয়া চিহ্নিত হইয়া পড়েন; ইহার বিপরীতে, তাঁহারাও যে আর্ট উপভোগ করিতে সক্ষম, তাঁহাদেরও যে সৌন্দর্য্য উপভোগ করিবার রসবোধ আছে, তাহাই জানাইবার জন্য ঐ সকল আর্টরহিত চিত্রাদিকে আর্টের আদর্শ বলিয়া ঢাক পিটাইতে পরাঙ্মুখ হন না। কেবল তাহাই নহে, তখন তাঁহারা আর্টের সমঝদার নাম পাইবার প্রত্যাশায় তোতাপাখীর ন্যায় ঐ সকল রচনা সম্বন্ধে কতকগুলি বাঁধিবুলি সাগ্রহে গিলিতে থাকেন, এবং মনে করেন যে, তাঁহারা সত্যই ঐ সকল রচনায় আর্ট দেখিতে পাইতেছেন। এই প্রকারে ধীরে ধীরে ঐ সকল অশ্লীল ও ন্যক্কারজনক বীভৎস ভাব জন-সাধারণের অস্থিমজ্জাগত, প্রকৃতিগত হইয়া জনসমাজকে মিথ্যার পথে, সর্ব্বনাশের পথে, ধ্বংসের পথে টানিয়া লইয়া চলে।

ইতি শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর কথিত "আর্ট ও
সাহিত্য" কথায় আর্ট ও তাহার অঙ্গত্রয়
বিষয়ক নবম কথা সমাপ্ত।

০০০ওঁ০০০

দশম কথা—আর্টের কেন্দ্র ও সেকালের উপন্যাস।

ভগবান যে আর্টের কেন্দ্র, ইহা আমরা নানা সূত্রে নানা দিক হইতে সত্য বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছি। এইবারে আমরা দেখিব যে, বর্ত্তমানে মুদ্রাযন্ত্র হইতে উপন্যাসের নামে যে সকল রাশি রাশি গ্রন্থ বাহির হইতেছে, সেই সকল গ্রন্থের কেন্দ্রে আর্টের এই কেন্দ্র রক্ষিত হইয়াছে কি না।

ইহা সর্ব্ববাদসম্মত যে, উপন্যাস নামে আজকাল যে সকল গ্রন্থ প্রকাশ হইতেছে, তাহার প্রায় আধাআধি উপন্যাসনামেরই উপযুক্ত নহে; আর বাকী অর্দ্ধেকেরও প্রত্যেকটী ধরিয়া আলোচনা করা অসম্ভব। তাহা ছাড়া, প্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিকদিগেরও সকল প্রসিদ্ধ উপন্যাসগুলিও যে আমরা পড়িয়াছি, এমন কথাও বলিতে পারি না। তবে অল্প-স্বল্প যাহা কিছু, পড়িয়াছি তাহা হইতেই বর্ত্তমানে উপন্যাসের গতি কোন্ দিকে, তাহা উপলব্ধি করিয়াছি, এবং উপলব্ধি করিয়া প্রাণে বড়ই আঘাত পাইয়াছি। মনের কথা এতদিন মনেই রাখিয়াছিলাম। কিন্তু সম্প্রতি দেখিতেছি যে আমাদের ন্যায় আরও অনেকে বর্ত্তমান উপন্যাসের ভাবগতি পর্য্যালোচনা করিয়া প্রাণে আঘাত পাইতেছেন। তন্মধ্যে সম্প্রতি সুহৃদ্বর শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সিংহ তাঁহার নবপ্রকাশিত "সাহিত্যের স্বাস্থ্যরক্ষা" গ্রন্থে নির্ভীকভাবে এই গতির বীভৎস ও ভয়াবহ পরিণাম সুস্পষ্টরূপে প্রদর্শন করিতে অগ্রসর হইয়াছেন। তাঁহা-

রই অনুসরণ করিয়া এক্ষণে আমরাও আর্টের সহিত বর্ত্তমান উপন্যাসের সম্বন্ধ আলোচনা উপলক্ষে তাহার গতি সম্বন্ধে আমাদের দুই-চারিটী বক্তব্য প্রকাশে সাহসী হইতেছি।

এই বিষয়ে, সমালোচনা বলিলে ধৃষ্টতা হয়, একখানি আলোচনাগ্রন্থ প্রকাশ করিবার ইচ্ছা বহুদিন যাবৎ অন্তরে পোষণ করিতেছিলাম, কিন্তু নানা কারণে এ পর্য্যন্ত তাহাতে হস্তক্ষেপ করিতে সাহস করি নাই। সর্ব্বপ্রথমেই সম্মুখে একটা পর্ব্বতসমান বাধা আসিয়া উপস্থিত হয়—কাহার গ্রন্থ ছাড়িয়া কাহার গ্রন্থ আলোচনাক্ষেত্রে উপস্থিত করিব? যাঁহার গ্রন্থ ছাড়িয়া দিব, ভয় হয়, পাছে তিনি মনে করেন যে তাঁহার গ্রন্থ অবজ্ঞাপূর্ব্বক উপেক্ষিত হইয়াছে। আর আমি জানি যে, উপন্যাসলেখকদিগের মধ্যে অনেকে আমা অপেক্ষা জ্ঞানে, মানে, ধর্ম্মে, বুদ্ধিতে শ্রেষ্ঠ ও পূজ্য আছেন। তাই আমার আশঙ্কা হয় যে, তাঁহাদের গ্রন্থ সম্বন্ধে কোন কথা বলিতে যাওয়াই আমার পক্ষে ধৃষ্টতা বলিয়া গণ্য হইবে। তৎসত্ত্বেও আমি অত্যন্ত সভয়ে সসঙ্কোচে মনের দুঃখে প্রাণের আবেগে এবং কর্ত্তব্যের অনুরোধে আমার দুইচারিটী বক্তব্য বলিতে বসিয়াছি। সাধারণতঃ প্রত্যেক চরিত্র বিশ্লেষণ করিয়া যে ভাবে উপন্যাসের সমালোচনা করা হয়, আমি সেভাবে কোন উপন্যাস সমালোচনা করিতে বসিব না। আরাম-চৌকিতে বসিয়া বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে যে ভাবে কোন বিষয়ের

আলোচনা করা হয়, আমরা এই বিষয়েরও সেইভাবে আলোচনা করিতে মনস্থ করিয়াছি। সকল দিক বিবেচনা করিয়া আমরা স্থির করিয়াছি যে, আমাদের বক্তব্য বুঝাইবার বা সমর্থনের জন্য যে দুএকজন স্থিতপ্রতিষ্ঠ গ্রন্থকারের যেটুকু সাহায্য লওয়া আবশ্যক মনে করিব, আমরা সেইটুকু সাহায্য লইব। তদ্ভিন্ন অন্যান্য অনেক ঔপন্যাসিকের গ্রন্থ উপন্যাসবিভাগে খুব উচ্চ আসন পাইবার অধিকারী হইলেও সেগুলির আলোচনা দূরে থাক, উল্লেখ পর্য্যন্ত করাও সম্ভব হইবে না।

বাঙ্গালা উপন্যাসকে মোটামুটি দুই ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে—সেকালের এবং একালের। বঙ্কিমচন্দ্রের পূর্ব্বে টেকচাঁদ ঠাকুর (প্যারীচাঁদ মিত্র) উপন্যাস রচনার সূত্রপাত করিলেও বর্ত্তমানে উপন্যাস যে ভাবে গড়িয়া উঠিয়াছে, বঙ্কিমচন্দ্র যে তাহার জন্মদাতা ও পথপ্রদর্শক তাহা সর্ব্ববাদসম্মত। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস অবধি পূজ্যপাদ রবীন্দ্রনাথের রাজর্ষি পর্য্যন্ত আমরা বোধ হয় সেকালের উপন্যাসের অন্তর্ভুক্ত ধরিতে পারি। বলা বাহুল্য যে, শ্রীশচন্দ্র মজুমদার প্রভৃতি অনেক সুপ্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিকের উপন্যাসও উহারই মধ্যে পড়িয়া যায়। রবীন্দ্রনাথের নষ্টনীড়, চোখের বালি প্রভৃতি উপন্যাস হইতেই বোধ হয় একালের উপন্যাসের আরম্ভ ধরা যাইতে পারে। ঠিক যে কাহার কোন্ গ্রন্থ হইতে একালের উপন্যাসের সূত্রপাত হইল তাহা বলা সম্ভব নহে। এই একালের উপন্যাসের ধারা

এখনও নবোদিত সুলেখক শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সজোরে চালাইয়া চলিয়াছেন। বিস্তর লব্ধপ্রতিষ্ঠ ঔপন্যাসিকের উপন্যাস যে একালের অন্তর্ভুক্ত, তাহা বোধ হয় কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবে না। আমরা যতটুকু আলোচনা করিয়াছি, তাহাতে মনে হয় যে, সাধারণত একালের অপেক্ষা সেকালের উপন্যাসগুলিতে আর্টের তিনটী অঙ্গেরই যথাযোগ্য সমাবেশ সমধিক পরিমাণে দৃষ্ট হয়। সেই কারণে সেকালের উপন্যাসগুলি বারম্বার পড়িলেও আবারও পড়িতে ইচ্ছা হয়; কিন্তু একালের অনেক উপন্যাস একবার পড়িলে দ্বিতীয়বার স্পর্শ করিতেও প্রবৃত্তি হয় না। তাই বলিয়া এমন কথা বলি না যে, একালের কোন উপন্যাসেই আর্টের অঙ্গত্রয়ের যথাযোগ্য সমাবেশ দৃষ্ট হয় না।

সেকালের উপন্যাসসমূহের একটী প্রধান লক্ষণই দেখা যায় এই যে, গ্রন্থকারেরা ভগবানকে তাঁহাদের আর্টের কেন্দ্ররূপে নয়নের সম্মুখে সর্ব্বদাই সযত্নে ধারণ করিয়া উপন্যাসরচনায় হস্তক্ষেপ করিতেন। আমরা বঙ্কিমচন্দ্রের দেবীচৌধুরাণীতে এবং রবীন্দ্রনাথের রাজর্ষিতে ইহার জাজ্বল্যমান প্রমাণ প্রাপ্ত হই। বঙ্কিমচন্দ্রের যে সকল উপন্যাস নানা কারণে সাধারণ্যে অপেক্ষাকৃত অধিকতর প্রশ্রুত, তন্মধ্যে দেবীচৌধুরাণী অন্যতর। এই গ্রন্থের নাম শোনে নাই, এমন বাঙ্গালী শিক্ষিত কেহ আছেন কি না সন্দেহ। বঙ্গবিভাগের পর দেশবাসীগণ

স্বদেশপ্রেমে উন্মত্ত হইয়া যখন দেশমাতৃকার বিভাগ উঠাইয়া দিতে কৃতসংকল্প হইলেন, তখন তাঁহাদের অনেকে বঙ্কিম-চন্দ্রের দেবীচৌধুরাণী এবং আনন্দমঠ, এই দুই গ্রন্থোক্ত কার্য্য-প্রণালীকেই আদর্শরূপে বরণ করিয়া লইয়াছিলেন। এই দেবীচৌধুরাণীকে আমরা সেকালের উপন্যাসের অন্যতর আদর্শ বলিয়া ধরিতে পারি। ভগবদ্ভক্তি এবং ভগবানের উপর সম্পূর্ণ শ্রদ্ধা ও নির্ভর রাখিয়া নিষ্কাম কর্ম্ম করিতে শিক্ষা দেওয়াই হইল এই গ্রন্থের মূলমন্ত্র। গ্রন্থকার অবশ্য এই মূল মন্ত্রটীকে গ্রন্থের প্রথমেই ব্যক্ত করেন নাই—না করিয়া ভালই করিয়াছেন। তিনি গ্রন্থের এই বীজমন্ত্রটীকে উপন্যাসের ঘটনাবৈচিত্র্যের মধ্য দিয়া মিষ্টভাবে আপনাপনি ফুটিয়া উঠিতে দিয়াছেন; তাই এই স্বভাবপরিস্ফুট বীজমন্ত্রের সুগন্ধ উপন্যাসটীর অঙ্গে অঙ্গে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। গ্রন্থের সর্ব্বশেষে গ্রন্থকার এই মন্ত্রের প্রস্ফুটিত কমল সর্ব্বসমক্ষে ধারণ করি-লেন—পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাং। ধর্ম্মসংস্থা-পনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥ দেবীচৌধুরাণীর ন্যায় বঙ্কিম-চন্দ্রের অন্যান্য গ্রন্থেও, এমন কি বিষবৃক্ষেও, ভগবানকে কেন্দ্রে ধ্রুব নক্ষত্ররূপে রাখা হইয়াছে স্পষ্টই দেখা যায়।

এদিকে রবীন্দ্রনাথের রাজর্ষিরও মূলসূত্র হইল অন্ধ কুসং-স্কারের পরিবর্ত্তে রাজ্যে সত্য ভগবানকে প্রতিষ্ঠিত করা। রাজা গোবিন্দমাণিক্যের বিরুদ্ধে যখন তাঁহার ভ্রাতা নক্ষত্ররায়

সমস্ত স্নেহবন্ধন ছিন্ন করিয়া যুদ্ধার্থে উপস্থিত হইলেন, তখন তিনি রাজ্য ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে প্রস্তুত হইলেন বটে, কিন্তু রাজ্য হইতে বলিদান রহিত করিবার জন্য ভগবানের যে আদেশ পাইয়াছিলেন, সেই আদেশ রহিত করিবার নামগন্ধও করিলেন না। ভগবদ্ভক্তিই, ভগবানের উপর অটল নির্ভরই এই উপন্যাসের মজ্জাগত ভাব। বৌঠাকুরাণীর হাট প্রভৃতি রবীন্দ্র-নাথের সেকালের আরও যে কয়টী উপন্যাস আমরা পড়িয়াছি, সকলগুলির মধ্যেই দেখি যে, আমাদের দেশের প্রকৃতিগত ভগ-বানের প্রতি একান্ত নির্ভর জাজ্বল্যমান মূর্ত্তিতে কেন্দ্রস্বরূপে দাঁড়াইয়া আছে। রাজর্ষির ন্যায় রবীন্দ্রনাথের বৌঠাকুরাণীর হাটেরও কেন্দ্র ভগবান এবং তাঁহার প্রতি একান্ত নির্ভর।

কিন্তু একালের অধিকাংশ উপন্যাসে গ্রন্থকারেরা ভগবানকে সযত্নে ছাঁটিয়া ফেলিতে চাহেন বলিয়া মনে হয়। বর্ত্তমানে এমন অনেক কবি আছেন যাঁহারা ভগবানের নামে শিহরিয়া উঠেন; যাঁহারা মনে করেন যে, কবিতার মধ্যে কতকগুলি আবশ্যক বা অনাবশ্যক হাহুতাশ থাকা চাই-ই; শান্তিসমুদ্র ভগবানের নাম থাকিলে নাকি কবিত্ব প্রকাশের অবসরই থাকে না! সেইরূপ বর্ত্তমানে এমন অনেক ঔপন্যাসিকও জাগিয়া উঠিয়াছেন, যাঁহারা তাঁহাদের উপন্যাসে ভগবানকে একেবারেই আমল দিতে চাহেন না। আবার এমনও অনেক

উপন্যাসলেখক আছেন, যাঁহারা বুঝেন যে, উপন্যাসে ভগবানকে সুবিধামত প্রবেশ করাইতে পারিলে তাহাতে একটু শ্রী আসে। তাই তাঁহারা তাঁহাদের উপন্যাসে ভগবানকে একটু খোসপোষাকী ধরণে থাকিবার অনুমতি প্রদান করেন!

দুঃখের বিষয়, অনেক সুপ্রসিদ্ধ উপন্যাসলেখকও এই ভাবের হাত এড়াইতে পারেন নাই। ইহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছুই নাই। ইহা দেশব্যাপী অনুকরণপ্রিয়তা ও দাসভাবের ফল। পাশ্চাত্য দেশে—অন্তত যুদ্ধের পূর্ব্বে—এই ভাবের কিছু বাড়াবাড়ি হইয়াছিল। দাসভাবের ফলে আমরা তাহারই অনুকরণ করিতে গিয়াছি মাত্র। সমগ্র দেশের গায়ে-গায়ে যখন দাসভাব মাখানো আছে, তখন সুপ্রসিদ্ধ উপন্যাস-লেখকদিগের গাত্রে তাহার স্পর্শ না লাগাই অসম্ভব। আমরা তো স্পষ্টই দেখি যে, বঙ্গের অনেক একালের উপন্যাস-লেখক দেশবাসীর নিকটে তাঁহাদের উপন্যাসগুলি সম্পূর্ণ নূতন বা original বলিয়া পরিচিত করিতে চাহিলেও সেগুলির অধিকাংশই পাশ্চাত্য উপন্যাসের অনুকরণে লিখিত। এমন কি, একালের অধিকাংশ উপন্যাস পড়িবার সময়, খুব অল্প কয়েক স্থল বাদ দিলে, মনে হয় যে, পাশ্চাত্য আধুনিক উপন্যাসলেখকদিগের গ্রন্থের অনুবাদ পড়িতেছি। দাসভাবের ফলেই এই সকল পাশ্চাত্য উপন্যাসের ভাবধারা—ভগবানকে

অনাবশ্যক বোধে ছাঁটিয়া ফেলিবার ভাব—এদেশেরও একালের উপন্যাসে স্থায়িত্ব লাভের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছে।

ইতি শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর কথিত "আর্ট ও সাহিত্য"
কথায় আর্টের কেন্দ্র ও সেকালের উপন্যাস
বিষয়ক দশম কথা সমাপ্ত।

একাদশ কথা—আর্টের লক্ষ্য ও সেকালের উপন্যাস।

ভগবানকে সেকালের উপন্যাসের কেন্দ্রে সুপ্রতিষ্ঠিত রাখা হইত বলিয়াই উহাতে মঙ্গলভাবেরও অভাব দৃষ্ট হয় না। এই কারণেই দেবীচৌধুরাণীর প্রথম অবধি শেষ পর্য্যন্ত ছত্রে ছত্রে পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় এই মঙ্গলভাব পরিব্যাপ্ত দেখি। গ্রন্থকার গ্রন্থের ভূমিকায় কয়েকটী ইংরাজী বাক্য উদ্ধৃত করিয়াছেন। তাহা হইতেও তাঁহার মনোভাব সুব্যক্ত হইয়া পড়িয়াছে। সেই কয়েকটী বাক্যের বঙ্গানুবাদ হইতেছে—"ধর্ম্মের সার উৎকর্ষ সাধন"; "ইহার ফল উন্নত জীবন"; "যে দিক দিয়াই দেখ, মানুষের উন্নতির সাধারণ নিয়ম হইতেছে এই যে, মানুষ ক্রমশই অধিক-তর ধর্ম্মপ্রবণ হয়"। আরও কয়েকটী বিষয় হইতে আমরা গ্রন্থকারের মনোগত মঙ্গলভাবের সুপরিচয় প্রাপ্ত হই। মহাত্মা গান্ধি চরকারূপী সুমঙ্গল চক্রের যে মঙ্গলবাণী সমগ্র দেশে ঘোষণা করিয়াছেন, বঙ্কিমচন্দ্রও দেবী চৌধুরাণীর প্রারম্ভেই সেই চরকাকে প্রকারান্তরে দেশের উপবাসী সন্তানদিগের জীবনরক্ষার উপায় ও মঙ্গলের কারণরূপে ইঙ্গিত করিয়াছেন। নিষ্ঠুর দলাদলির কারণে দেশের বিধবাগণ তাঁহাদের কন্যা-দিগকে লইয়া কি প্রকার অসহায় অবস্থায় পড়েন, বিবাদের কি প্রকার কঠোর কশাঘাত সহ্য করিতে বাধ্য হন, গ্রন্থকার এই গ্রন্থেই তাহার নিখুঁৎ চিত্র আঁকিয়া কেমন অন্তর্নিগূঢ়

মিঠেকড়া ভাষায় দেশবাসীকে দলাদলি করিতে নিষেধ করিয়াছেন।

অন্য দৃষ্টান্তের প্রয়োজন নাই—নিম্নের একটীই যথেষ্ট। স্ত্রীলোকের চক্ষে যে সপত্নীত্ব সর্ব্ববিধ অমঙ্গল ও অশান্তির সর্ব্বপ্রধান কারণ, গ্রন্থকার সিদ্ধহস্তে দেখাইয়াছেন যে, প্রাণের ভিতর মঙ্গল ইচ্ছা থাকিলে সেই সপত্নীত্বের ভিতর দিয়াও মঙ্গলের পথে অগ্রসর হওয়া যায়। গ্রন্থকার এই বিষয়ের দুই বিভিন্ন চিত্র তাঁহার দেবীচৌধুরাণী ও বিষবৃক্ষ, এই দুই গ্রন্থে দুই বিভিন্ন আকারে আঁকিয়া দেখাইয়াছেন। গ্রন্থকার আর কোন গ্রন্থ না লিখিলেও কেবল এই দুইটী চিত্রের জন্যই সাহিত্য-জগতে অমর হইয়া থাকিতেন। এই দুইটী চিত্রের জন্য আমরা শতবার বলিব—গ্রন্থকার ধন্য, বাঙ্গালা সাহিত্য ধন্য।

বঙ্কিমবাবুর অন্যান্য গ্রন্থেরও লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য যে মঙ্গল-সাধন, তাহাতে সন্দেহ নাই। তাঁহার আনন্দমঠের শেষে তিনি খুলিয়াই লিখিয়াছেন—"কে কাহাকে ধরিয়াছে? জ্ঞান আসিয়া ভক্তিকে ধরিয়াছে, ধর্ম্ম আসিয়া কর্ম্মকে ধরিয়াছে; বিসর্জ্জন আসিয়া প্রতিষ্ঠাকে ধরিয়াছে"। এই উক্তিতে destruction অপেক্ষা constructionএর, ধ্বংস অপেক্ষা সৃষ্টির, মৃত্যু অপেক্ষা জীবনের শ্রেষ্ঠত্ব প্রদর্শিত হইয়াছে। অন্য গ্রন্থ দূরে থাক, বিষবৃক্ষেও মঙ্গলভাব যে তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল, তাহা তাঁহার "আমরা বিষবৃক্ষ সমাপ্ত করিলাম। ভরসা করি, ইহাতে

গৃহে গৃহে অমৃত ফলিবে" এই উক্তি হইতেই প্রকাশ পাইতেছে।

কিন্তু বলিতে সাহস হয় না, অথচ সত্য কথা বলিতে হইলেও বলিতে হয় যে, বঙ্কিমচন্দ্র জনহিতসাধনকে তাঁহার বিষবৃক্ষের চরম লক্ষ্য বলিয়া প্রকাশ করিলেও এই গ্রন্থের অনেকগুলি ঘটনাসন্নিবেশে লক্ষ্য হইতে দূরে গিয়া পড়িয়াছেন। এই গ্রন্থের পরিণামে সতী স্ত্রী সূর্য্যমুখীর সংসার-সংগ্রামে জয়লাভ প্রদর্শিত হইয়াছে সত্য; কিন্তু এই সুন্দর গ্রন্থে হীরা কর্তৃক কুন্দনন্দিনীর বিষভক্ষণের ব্যবস্থা, দেবেন্দ্রের বৈষ্ণবীর সাজে জ্ঞাতিশত্রু নগেন্দ্রের অন্তঃপুরে যাওয়া প্রভৃতি অশ্লীল ও অন্যায় ঘটনাসকল সন্নিবিষ্ট করা হইল কে—ন? কি—কারণে? আমরা তো যতদূর বুঝি, তাহাতে মনে হয় যে, এই সকল অশ্লীল ও দুর্নীতির অনুকূল ঘটনাগুলি কেবল নিষ্প্রয়োজনে সন্নিবিষ্ট করা হয় নাই, সেগুলির জন্য গ্রন্থের মঙ্গল উদ্দেশ্যের এবং সৌন্দর্য্যেরও যথেষ্ট হানি হইয়াছে। গ্রন্থকার আবার এই ঘটনাগুলিকে বিশেষ মনোমুগ্ধকর সজ্জায় উপস্থিত করিবার কারণে এই চিত্রগুলি পাঠকের মনে গভীররূপে খোদিত হইয়া বিষময় ফল উৎপাদন করে। গ্রন্থকার স্বয়ং লিখিয়াছেন—"রিপুর প্রাবল্য ইহার বীজ। * * চিত্তসংযমের অভাবই ইহার অঙ্কুর, তাহাতেই এই বৃক্ষের বৃদ্ধি। * * ইহার ফল বিষময়; যে খায়, সে-ই মরে। * * পাত্রবিশেষে বিষবৃক্ষে রোগশোকাদি

নানাবিধ ফল। * * চিত্তসংযমপক্ষে প্রথমত চিত্তসংযমে প্রবৃত্তি, দ্বিতীয়ত চিত্তসংযমের শক্তি আবশ্যক। ইহার মধ্যে শক্তি প্রকৃতিজন্যা; প্রবৃত্তি শিক্ষাজন্যা। প্রকৃতিও শিক্ষার উপর নির্ভর করে। সুতরাং চিত্তসংযমপক্ষে শিক্ষাই মূল"। ইহা হইতে স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, বঙ্কিমবাবু বিষবৃক্ষের ফল কি, তাহা বেশ ভালরূপই জানিতেন; এবং শিক্ষাও যে সেই বিষবৃক্ষকে নির্ম্মূল করিবার বলিতে গেলে একমাত্র উপায়, তাহাও বিশেষভাবে উপলব্ধি করিয়াছিলেন। কিন্তু দেবেন্দ্রের বৈষ্ণবীসাজে কুন্দের সঙ্গে সাক্ষাৎ বা কুন্দের বিষভক্ষণ প্রভৃতি সুবর্ণিত ঘটনাসন্নিবেশের ফলে পাঠকদিগের চিত্তপ্রবৃত্তির সংযম-শিক্ষা বিষয়ে সহায়তা হইবে, ইহা যদি তিনি ভাবিয়া থাকেন, তবে সেটা তাঁহার মস্ত ভুল হইয়াছে স্বীকার করিতেই হইবে। এই গ্রন্থ হইতে গ্রন্থকার অমৃত ফল দেখিবার আশা করিয়াছেন বটে, কিন্তু ঐ মন্দ বস্তুকে সুন্দর মূর্ত্তি দিয়া তুলিয়া ধরিবার ফলে আমরা আজ পর্য্যন্ত কোন গৃহে এই গ্রন্থ হইতে অমৃত ফল ফলিয়াছে বলিয়া তো শুনি নাই; বরঞ্চ এই গ্রন্থেরই প্রত্যক্ষ ফলে অনেক গৃহে "হৃদ্‌রোগে, উদ্বন্ধনে, বিষপানে অকালে জীবন বিসর্জ্জন" করিবার কথা শোনা গিয়াছে। কাদা ঘাঁটিলেই গায়ে যে কাদা লাগিবে, তাহা তো জানা কথা। গ্রন্থকারেরও অন্তরে যে তাঁহার বিষবৃক্ষের বিষময় ফল ফলিবার আশঙ্কা জাগিয়াছিল, তাহা তাঁহার অমৃতফল দেখিবার আশা-প্রকাশেই

অনেকটা সপ্রমাণ হইতেছে। শোনা যায় যে স্বয়ং গ্রন্থকারকেও এ সম্বন্ধে শেষ বয়সে অনুতাপ প্রকাশ করিতে হইয়াছিল।

বঙ্কিমচন্দ্রের দেবীচৌধুরাণীর ন্যায় রবীন্দ্রনাথের রাজর্ষি উপন্যাসের ভিতর দিয়াও মঙ্গলভাব শতধারে ফুটিয়া বাহির হইতেছে। ভগবানকে যখন এই গ্রন্থের কেন্দ্রে রাখা হইয়াছে, তখন মঙ্গলভাবও যে গ্রন্থের অনেকাংশে পরিব্যাপ্ত হইয়া থাকিবে, তাহা কিছুই আশ্চর্য্য নহে। রাজা গোবিন্দমাণিক্যের প্রত্যেক কার্য্যে প্রত্যেক কথায় মঙ্গলভাব শতস্রোতে উৎসারিত হইয়া পড়িতেছে। গোবিন্দমাণিক্য যখন তাঁহার বিদ্রোহী ভূতপূর্ব্ব পুরোহিতকে বলিতেছেন—"আর কেন প্রজাদিগকে কষ্ট দিতেছ? আমি নক্ষত্ররায়কে রাজ্য ছাড়িয়া দিয়া চলিয়া যাইতেছি। তোমার মোগল সৈন্যদের বিদায় করিয়া দাও"—এই উক্তির ভিতর দিয়া প্রজার দুঃখে ব্যথিতহৃদয় রাজার প্রাণের ব্যথা যেন রক্তমাখা আকারে প্রকাশ হইয়া পড়িতেছে। রাজার এই উক্তিতে রাজা হরিশ্চন্দ্রের প্রজাবাৎসল্যের প্রতিচ্ছবি পাওয়া যায় না কি? বঙ্কিমচন্দ্রের দেবীচৌধুরাণী, রবীন্দ্রনাথের রাজর্ষি প্রভৃতির ন্যায় গ্রন্থ পাঠ করিয়া আত্মহারা হইতে হয় এবং গ্রন্থকারদিগের চরণে মস্তক স্বতই অবনত হইয়া পড়ে।

রবীন্দ্রনাথের বৌঠাকুরাণীর হাটেরও কেন্দ্র হইলেন ভগবান এবং সেই কারণেই শত অমঙ্গল ভেদ করিয়াও মঙ্গলভাবই

উপন্যাসটীকে আচ্ছাদিত করিয়া রাখিয়াছে। প্রতাপাদিত্যের পুত্র উদয়াদিত্য, প্রতাপাদিত্যের পিতৃব্য রাজা বসন্তরায়, উদয়াদিত্যের স্ত্রী সুরমা এবং ভগ্নী বিভা প্রভৃতির চরিত্রের ভিতর দিয়া মঙ্গলভাব যেন অনুক্ষণ ঝরিতেছে।

কিন্তু বড়ই সঙ্কোচের সহিত বলিতে বাধ্য হইতেছি যে, বিষবৃক্ষে বঙ্কিমচন্দ্রের ন্যায় বৌঠাকুরাণীর হাটের ন্যায় এমন সুন্দর উপন্যাসেও রবীন্দ্রনাথ কয়েকটী মঙ্গলবিরুদ্ধ ভাবের নিষ্প্রয়োজন অবতারণা করিয়া গ্রন্থের আদর্শ অনেক পরিমাণে ক্ষুন্ন করিয়াছেন। উদয়াদিত্যের ভগ্নীপতি রামচন্দ্র রায় এবং রামচন্দ্রের অন্যতর মোসাহেব রমাই ভাঁড়। রামচন্দ্রকে এবং তাঁহার পারিষদবর্গকে দেঁতোর হাসি হাসাইবার জন্য রমাই ভাঁড় উদয়াদিত্যকে জড়াইয়া বিভার উদ্দেশে যে অশ্লীল রসিকতা করিয়াছে, সে রসিকতার কোন প্রয়োজন ছিল বলিয়া মনে হয় না। বেশ বোঝা যায় যে, রমাই ভাঁড়ের ভেঁড়োমি একটু বেশী ফুটাইয়া তুলিবার জন্যই একটু জোরজবরদস্তি করিয়া এই ইয়ারকিটুকুর অবতারণা করা হইয়াছে। আমরা শতবার বলিব, এই রসিকতার সন্নিবেশ রবীন্দ্রনাথের গ্রন্থের উপযুক্ত হয় নাই।

আরও একটী চিত্র এই মঙ্গলভাবে পূর্ণ গ্রন্থে অমঙ্গলের বীভৎস দৃশ্য দেখাইয়া আমাদিগকে ব্যথিত করিয়া তুলে। রুক্মিণী (বা মঙ্গলা) কর্ত্তৃক পরোক্ষভাবে উদয়াদিত্যের পত্নী

সুরমাকে বিষপ্রয়োগে হত্যা করিবার পালা ঢুকাইয়া গ্রন্থে একটা বড়ই বেসুরা ভাব প্রবেশ করানো হইয়াছে। সুরমাকে চিরনির্ব্বাসিত করিবার পূর্ব্বেই যাহাতে তাঁহা হইতে তাঁহার স্বামীর মনটুকুও বিচ্ছিন্ন হয়, সেই উদ্দেশ্যে সুরমার শাশুড়ীই মঙ্গলার পরামর্শে সুরমাকে "গুণ" করিবার জন্য মঙ্গলাদত্ত বিষ তাঁহাকে খাওয়ান এবং তাহার ফলেই সুরমার মৃত্যু হয়। এই বিষপ্রয়োগটুকু গ্রন্থে স্পষ্ট উল্লিখিত না থাকিলেও তাহার যথেষ্ট ইঙ্গিত আছে। আমরা তো দেখি যে, এই বিষের সাহায্যে কেবল অন্যায়রূপে প্রতিহিংসাপরায়ণ এক অসতী স্ত্রীলোকের চরিত্র ফুটাইয়া তুলিবার চেষ্টা হইয়াছে। কিন্তু কে—ন? কিসের—জন্য? এই চিত্রের প্রতিবেশে (contrastএ) গ্রন্থের কোন্ চরিত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে? আমরা জানি না, প্রতাপাদিত্যের ইতিহাসে এই ঘটনার কোন সূত্র পাওয়া যায় কি না। যদি পাওয়া যায়ও, তবু আমরা মনে করি যে, আলোচ্য উপন্যাসে এই বিষয়ের ইঙ্গিতমাত্র উল্লেখ করিলেই যথেষ্ট হইত। আর যদি না পাওয়া যায়, তবে এমন সুন্দর আর্টপূর্ণ উপন্যাসে এই অমঙ্গলজনক অন্যায় কার্য্যের সবিস্তার বর্ণনাসহ সন্নিবেশ কেবল অনাবশ্যক মনে করি না, গুরুতর অন্যায় মনে করি; অমঙ্গলসূচকতার জন্য গ্রন্থে এই বিষয়ের নিষ্প্রয়োজন সমাবেশের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ না করিয়া থাকা যায় না।

যাই হোক্, দুএক স্থলে এইরূপ অমঙ্গলপ্রসূ বিষয়ের অব-

তারণা থাকিলেও মোটের উপর সেকালের উপন্যাসগুলিতে মঙ্গলভাব যে পরিব্যাপ্ত থাকিত, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই— সেকালের যে কোন উপন্যাস পড়িলেই এই কথার যাথার্থ্য উপলব্ধ হইবে।

কিন্তু একালের অধিকাংশ উপন্যাসে দেখা যায় যে, গ্রন্থকারেরা তাঁহাদের গ্রন্থে মঙ্গলভাবের সমাবেশ আবশ্যকই মনে করেন না। যাঁহাকে অবলম্বন করিয়া প্রকৃতিতে মঙ্গলভাবের অস্তিত্ব, সেই ভগবানকেই যখন তাঁহারা তাঁহাদের উপন্যাস হইতে অবসর দিতে প্রস্তুত, তখন বলা বাহুল্য যে, মঙ্গলভাব যে উপন্যাসের লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য হওয়া উচিত, সে কথাও তাঁহারা স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহেন। ঐ যেমন একালের অনেক উপন্যাসে খোসপোষাকী মূর্ত্তিতে ভগবানের উল্লেখ দেখা যায়, সেইপ্রকার একালের অনেক উপন্যাসে জোরজবরদস্তির সহিত কল্পনা করিয়া লইলে মঙ্গলভাবের অনুবীক্ষণগোচর একটা ক্ষীণধারা অনুভূত হইতে পারে। এই মঙ্গলভাবের অভাবের কারণেই একালের অনেক উপন্যাসে অশ্লীলতার তীব্র পূতিগন্ধ ও বিষবৃক্ষের বিষময় ভাবের প্রাচুর্য্য দৃষ্ট হয়।

আমরা ইতিপূর্ব্বে দেখিয়াছি যে, একালের অনেক উপন্যাসলেখকই আর্টের খাতিরে আর্ট, প্রত্যক্ষদ্যোতক আর্ট প্রভৃতি পাশ্চাত্যদিগের নিকটে ধার-করা বাক্যগুলিকে আর্টের মহামন্ত্র বলিয়া অন্তরে ধরিয়া থাকেন। এই সকল বাক্যের

দোহাই দিয়া তাঁহাদের উপন্যাসের ফলে মঙ্গল হউক বা অমঙ্গল হউক, সেদিকে তাঁহারা কোনই দৃষ্টি দিতে চাহেন না বলিয়া মনে হয়। এখন, সাধারণ মানবের ভিতরে একটা পশুভাব আছে দেখা যায়, যাহার জন্য সে পরের অমঙ্গল দেখিলে, নিজের তুলনায় অপরের অবনতি দেখিলে সুখী হয়। সেই কারণে আমরা আমাদের পরিপার্শ্বের অমঙ্গল অবনতি আসলে না চাহিলেও অন্তত উপন্যাসে নায়ক-নায়িকাদের ব্যক্তিগত অবনতি বা পতন দেখিলে কেমন যেন একটু সুখ পাই। কাজেই উপন্যাসলেখকেরা তাঁহাদের গ্রন্থের প্রচারবৃদ্ধির মানসে, সাধারণ পাঠকের মনোবৃত্তির অনুকল্পে জানত বা অজানত গ্রন্থোক্ত নায়ক-নায়িকাদের অবনতিব্যঞ্জক অমঙ্গল-প্রসূ ঘটনা ও চিত্রগুলিই বিশেষভাবে চিত্তহরণ আকারে উপস্থিত করেন। তাহার ফলে একালের অধিকাংশ উপন্যাস হইতে মহাদুর্গন্ধপূর্ণ উষ্মা নিয়তই বাহির হইতেছে বলিয়া অনুভূত হয়—উন্নত আদর্শ দেখাইয়া মানুষকে উন্নতির অভি-মুখে অগ্রসর করিয়া দিবার চেষ্টার বড়ই অভাব দেখা যায়।

আমরা ইহাও দেখিয়া আসিয়াছি যে, সেকালের উপরিউক্ত উপন্যাসে যে দুইচারিটী অশ্লীল ও অমঙ্গলপ্রসূ বিষয় সন্নিবিষ্ট হইয়াছে, সেগুলিকে বিশেষভাবে সৌন্দর্য্যমণ্ডিত করিয়াই প্রকাশ করা হইয়াছে। সেকালের ঔপন্যাসিকদিগেরই পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া একালের উপন্যাসলেখকগণ মাত্রা চড়াইয়া তাঁহাদের

উপন্যাসে এই অনিষ্টকর প্রথা খুবই বেশীরকম প্রচলিত করিতে চলিয়াছেন দেখি। অনেক ক্ষমতাশালী লেখক তাঁহাদের উপন্যাসে অশ্লীল ও অন্যায় বিষয়সকল ভাষার সৌন্দর্য্যে রচনার চাতুর্য্যে এতই সুন্দর করিয়া তুলেন যে, পাঠকেরা সেই সৌন্দর্য্য উপভোগ করিতে গিয়া অনেক সময়ে অজানতই ঐ অশ্লীল ও অমঙ্গলপ্রসূ বিষয়ে আত্মহারা হইয়া ডুবিয়া যান। অনেক উপন্যাসে পরিণামে মঙ্গলের জয় প্রদর্শিত হইলেও তাহাকেই ফুটাইয়া তুলিবার চেষ্টায় তাহার পৃষ্ঠভূমি- (background) স্বরূপে বহুল পরিমাণে অশ্লীল ও পাপচিত্র সমধিক ভাস্বরমূর্ত্তিতে প্রকাশ করা হয়। তাহার ফলে পূর্ব্বেও বলিয়াছি এবং আবারও বলিতেছি যে, অধিকাংশ পাঠকের মস্তিষ্ক হইতে মঙ্গলের পরিণামজয়ের চিত্র মুছিয়া গিয়া পাপচিত্রগুলিই স্থায়িরূপে খোদিত হইয়া যায়। আমরা খুবই আশ্চর্য্য হইয়া ভাবি যে, সুপ্রসিদ্ধ দেশহিতৈষী ও বালকদিগের মঙ্গলকামী লেখকেরাও কি প্রকারে মুক্ত গগনের মুক্ত বায়ু সেবনের পর ঐ সকল পাপচিত্রের দুর্গন্ধময় টাইফয়েডের বিষদুষ্ট বায়ু সেবন করিবার ও করাইবার জন্য তাঁহাদের সমুন্নত সিংহাসন হইতে নামিয়া আসিয়া তৃপ্তি পান।

পূজ্যপাদ রবীন্দ্রনাথ তাঁহার রাজর্ষি গ্রন্থের একস্থানে একটী মহা সত্যবাণী লিখিয়াছেন—"পাপের শেষ কোথায় গিয়া হয় কে জানে! পাপের একটী বীজ যেখানে পড়ে, সেখানে

দেখিতে দেখিতে গোপনে কেমন করিয়া সহস্র বৃক্ষ জন্মায়, কেমন করিয়া অল্পে অল্পে সুশোভন মানবসমাজ অরণ্যে পরিণত হইয়া যায় তাহা কেহ জানিতে পারে না।" ভবিষ্যৎ বংশ-পরম্পরাকে শরীরে, মনে, শৌর্য্যে, বীর্য্যে, ধর্ম্মে কর্ম্মে দৃঢ়িষ্ঠ বলিষ্ঠ দেখিতে চাহিলে, রবীন্দ্রনাথের ঐ সত্যবাণী অন্তরে সর্ব্বদা জাগ্রত রাখিয়া দেশহিতৈষী ও বালকগণের শুভার্থী দেশবাসী-গণের ব্যক্তিগতভাবে এবং সমবেতভাবে উপন্যাস এবং সাহি-ত্যের অন্যান্য বিভাগেও অশ্লীল ও অমঙ্গলপ্রসূ বিষয় সকল সন্নিবিষ্ট করিবার বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে হইবে। ভগবান দেশ-বাসীর অন্তরে এই শুভবুদ্ধি প্রদান করুন।

ইতি শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর কথিত "আর্ট ও সাহিত্য"
কথায় আর্টের লক্ষ্য ও সেকালের উপন্যাস
বিষয়ক একাদশ কথা সমাপ্ত।

ও

দ্বাদশ কথা—আর্টের প্রাণ—বঙ্কিমচন্দ্রে।

(ক) দেবীচৌধুরাণী ও আনন্দমঠ।

একালের অপেক্ষা সেকালের উপন্যাসলেখকগণ তাঁহাদের উপন্যাসে যেমন ভগবানকে কেন্দ্রে রাখিয়া মঙ্গলভাবকে লক্ষ্যস্থলে দাঁড় করাইতে পারিয়াছিলেন, সেইরূপ তাঁহারা একালের ঔপন্যাসিকদিগের অপেক্ষা তাঁহাদের উপন্যাসে প্রকৃতিকে ভিত্তি এবং স্বাভাবিকতাকে প্রাণরূপে প্রতিষ্ঠিত রাখিতে পারিয়াছিলেন বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। তাঁহারা তাঁহাদের উপন্যাসগুলিকে সত্যসত্যই প্রকৃতির উপরেই দাঁড় করাইবার চেষ্টা করিয়াছেন দেখা যায়। একালের ঔপন্যাসিকগণ, মনে হয় যেন, প্রকৃতির পরিবর্ত্তে প্রকৃতির বিকৃতিকেই তাঁহাদের উপন্যাসের ভিত্তি করিতে সর্ব্বদাই প্রস্তুত।

একালের মত সেকালে দুইপেনি তিনপেনি বা একশিলিং মূল্যের ইংরাজী বাজে নবেলের এত ছড়াছড়ি ছিল না, কাজেই সেকালের ঔপন্যাসিকগণ ইংরাজী (classical) শ্রেষ্ঠবর্গীয় উপন্যাসের অনুকরণ করিবার চেষ্টা করিলেও বেশী নকলনবিশি করিবার অবসর পান নাই। তাঁহাদিগকে একটু মস্তিষ্ক ঘামাইয়া যথার্থ প্রকৃতিকে নিজেদের উপন্যাসের ভিত্তি করিতে হইয়াছিল। যথার্থ প্রকৃতিকে ভিত্তি করাতেই একালের অপেক্ষা সেকালের উপন্যাসে স্বাভাবিকতাও যেন একটু বেশী পরিস্ফুট মনে হয়। কিন্তু আজকাল সস্তা ইংরাজী নবেলের বস্তা-বস্তা আমদানি

হওয়ায়, কেবল একটু দেশী পরিপার্শ্ব (surrounding) ও দেশী ভাবের সূক্ষ্ম আবরণ দিয়া সেই সমস্ত নবেলের নকলনবিশি করিবার বড়ই সুবিধা হইয়াছে। কোন্ নবেল হইতে কতটুকু চুরি হইল, কে-ই বা তাহার খবর রাখে? দেশীভাবের সামান্ত আবরণ থাকাতে চুরি বুঝিলেও তাহা ধরাইয়া দেওয়া বড়ই কঠিন হয়। কাজেই একালের উপন্যাসে বিলাতী উপন্যাসের নকলনবিশি খুব জোরেই চলিয়াছে। আবার এই সমস্ত নকল উপন্যাস গিলিয়া খাইবার ফলে অহাদের ভিতরের, আসলে বিলাতী অনিষ্টকর, ভাবগুলি মূলত এদেশের প্রকৃতিতে অসম্ভব হইলেও ক্রমেই যেন সম্ভব ও প্রকৃতিগত হইয়া উঠিতেছে। কবি দ্বিজেন্দ্রলালের উক্তি ক্রমেই আমাদের মজ্জাগত হইয়া আমাদের আচার-ব্যবহারেও পরিণতি ও স্বাভাবিকতালাভের চেষ্টা করিতেছে—"আমরা বিলেতফেরতা ক'ভাই, আমরা সাহেব সেজেছি সবাই, তাই কি করি নাচার, স্বদেশী আচার করিয়াছি সব জবাই; আমরা বাঙ্গালা গিয়েছি ভুলি, আমরা শিখেছি বিলিতি বুলি, তাই চাকরকে ডাকি বেয়ারা, আর মুটেদের ডাকি কুলি" * * "আমরা ছেড়েছি চটির আদর, আমরা ছেড়েছি ধুতি ও চাদর, আমরা হ্যাট বুট আর প্যাণ্ট কোট পরে সেজেছি বিলিতি বাঁদর; আমরা বিলাতি ধরণে হাসি, আমরা ফরাসি ধরণে কাসি, আমরা পা ফাঁক করে সিগারেট খেতে বড্ডই ভাল বাসি"।

এক দেবী চৌধুরাণীর সহিত একালের যে কোন উপন্যাস আলোচনা করিলেই আমাদের উক্তির যাথার্থ্য উপলব্ধ হইবে। দেবী চৌধুরাণীখানি পড়িলেই বেশ বোঝা যায় যে, গ্রন্থকার স্থানীয় ও সাময়িক প্রকৃতিকে প্রাণের ভিতর মিশাইয়া লইতে পারিয়াছিলেন। সেই কারণে স্থলে-স্থলে একআধটু অতি-রঞ্জিত হইলেও সাধারণত গ্রন্থোক্ত চিত্রগুলি খুবই স্বাভাবিক হইয়াছে। প্রফুল্লর মা, ব্রহ্মঠাকুরাণী, সাগর বৌ প্রভৃতির চরিত্রচিত্রে, অথবা সেই সময়ের পল্লীগ্রামের প্রাকৃতিক দৃশ্যের বা তদানীন্তন অবস্থার চিত্রে কোন খুঁৎ পাওয়া যায় কি না সন্দেহ। সর্ব্বপ্রথমেই ঘটনাচক্রে পড়িয়া দারিদ্র্য-নিষ্পিষ্ট উপবাসী মায়ে-ঝিয়ের কথোপকথনটী কি মর্ম্মস্পর্শীরূপে স্বাভা-বিক হইয়াছে। এই একটী নহে, গ্রন্থের প্রথম অবধি শেষ পর্য্যন্ত যে কয়টী চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে, তাহার প্রত্যেকটীই তো আমাদের নিকট খুব স্বাভাবিক মনে হয়। গ্রন্থের আদ্যন্তমধ্যে এই স্বাভাবিকতা রক্ষিত হইয়াছে বলিয়াই গ্রন্থখানি বারম্বার পাঠ করিলেও আমাদের নিকট উহা নিত্য নূতন মূর্ত্তিতে প্রকাশ পায়।

বঙ্কিমচন্দ্র ভারতের প্রকৃতি অন্তরে অন্তরে উপলব্ধি করিয়া-ছিলেন বলিয়াই একটী সামান্য ঘটনার সন্নিবেশেই ভারতের পরম্পরাগত স্বর্গীয় প্রকৃতির একটী চিত্র—রমণীর মাতৃত্বে শ্রদ্ধা—তাঁহার গ্রন্থে পরিস্ফুট করিতে সক্ষম হইয়াছেন। প্রফুল্ল

যখন ভবানী পাঠকের সহিত প্রথম সাক্ষাতে নিজের ধনরত্নের বিষয় ভয়ে ভয়ে লুকাইবার চেষ্টা করিতেছে, তখন ভবানী তাহাকে খুব স্বাভাবিক ভাবেই "মা" বলিয়া সম্বোধন করিল; সুন্দরী যুবতী প্রফুল্লও আশ্বস্ত হইল। এই মা বলিয়া আহ্বান পূর্ব্বক একটী নিঃসহায় রমণীকে আশ্বাসপ্রদান সম্পূর্ণই ভারতের নিজস্ব। যত বড় সুন্দরী হউক, কোন রমণীকে কোন পুরুষ একবার মা বলিয়া ডাকিলে তাহারা পরস্পরের সম্বন্ধে কোন কলুষিত কামভাব ব্যক্ত করা দূরে থাক, অন্তরেও পোষণ করিতে পারিবে না—এই ভাবটী ভারতবাসীর নিজস্ব, প্রকৃতিসিদ্ধ। সেই কারণেই পাছে স্বদলবলের কেহ প্রফুল্লর প্রতি তিলমাত্র কামভাব পোষণ করে, সেই ভয়ে ভবানী মুহূর্ত্তমধ্যে সকলকে ডাকিয়া বলিয়া দিল যে, প্রফুল্ল সকলের মা। গ্রন্থকার ভারতের এই প্রকৃতিসিদ্ধ চিত্র অঙ্কিত করিয়া নিজেও ধন্য হইয়াছেন এবং দেশকেও ধন্য করিয়াছেন। গ্রন্থকার রমণীর মাতৃত্বে ভারতবাসীর শ্রদ্ধার গভীরতা গ্রন্থের শেষ পর্য্যন্ত দেখাইয়াছেন। অন্য কোন দেশের উপন্যাসে এ কথা থাকিলে বোধ হয় যেন একটু অস্বাভাবিক ঠেকিত; ভারতের উপন্যাসেই এ কথা স্বাভাবিক।

বঙ্কিমচন্দ্র রমণীর মাতৃত্ব উপলব্ধি করিয়াছিলেন বলিয়াই স্বামী-স্ত্রীরও নির্ম্মল দাম্পত্যচিত্র আঁকিতে পারিয়াছেন। প্রফুল্ল ব্রজেশ্বরের বিবাহিত পত্নী। প্রতিবাসীরা কোন কারণে প্রফু-

রর নামে অন্যায় অপবাদ প্রচার করিল। এই অপবাদের কারণে একঘরে হইবার ভয়ে পিতার আদেশে ব্রজেশ্বর প্রফুল্লকে গৃহবহিষ্কৃত করিতে বাধ্য হইল। বহুকাল পরে ঘটনাচক্রে ব্রজেশ্বরের অপর এক পত্নী সাগর বৌয়ের ঘরে প্রফুল্লর সঙ্গে তাহার প্রথম পুনঃসাক্ষাৎ হয়। সেই সাক্ষাৎ অবধি প্রফুল্লকে ব্রজেশ্বরের চুম্বন করা পর্য্যন্ত চিত্রটী কি মিষ্ট, কি স্বাভাবিক! ইহা পুনঃপুনঃ পড়িলেও আবারও পড়িতে ইচ্ছা হয়।

এই স্বামী-স্ত্রীর প্রথম সাক্ষাতে কথোপকথনের পর এই চুম্বনের কথা পড়িয়া পাঠকের মনে কোন প্রকার বিসদৃশ বা অশ্লীল ভাব উদয় হইবার কোন সম্ভাবনা ছিল, আমরা কিছুতেই তাহা মনে করিতে পারি না। কিন্তু গ্রন্থকার এই উপলক্ষে নবীন পাঠকের প্রতি টিট্‌কিরি করিবার সাধ মিটাইতে গিয়া এমন সুন্দর ও স্বাভাবিক চিত্রের সৌন্দর্য্য যে যথেষ্ট নষ্ট করিয়াছেন—একথা আমরা খুবই সভয়ে বলিলেও অস্বীকার করিতে পারি না। গ্রন্থকারের ন্যায় প্রবীণ ও কৃতী লেখক কেন যে এই ভুল করিলেন—সামান্য একটু টিটকিরির জন্য নিষ্প্রয়োজনে পাঠকের মনে অশ্লীলতা অন্তঃসলিলভাবে জাগাইয়া দিয়া এমন স্বাভাবিক চিত্রে কেন যে অস্বাভাবিকতার একপোঁছ রং বুলাইয়া দিলেন, তাহা কিছুতেই আমাদের উপলব্ধিতে আসে না। গ্রন্থকার যদি স্বামী-স্ত্রীর এইপ্রকার নির্দ্দোষ চিত্রের ফলে পাঠকদের মনে অশ্লীলভাব জাগ্রত হওয়া সত্যই সম্ভব বলিয়া

মনে করিতেন, তাহা হইলে তিনি আবার বিষবৃক্ষে একরত্তি ছেলে সতীশচন্দ্রের সম্মুখে শ্রীশচন্দ্র ও তাহার পত্নী কমলমণির "বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়া" সচুম্বন দম্পতীকলহের আর একটী নিখুঁৎ চিত্র আঁকিতেন বলিয়া মনে হয় না। কৈ—এই চিত্রের জন্য তো তিনি নবীন পাঠকের স্কন্ধে দোষ চাপাইয়া কোন কৈফিয়ৎ দিলেন না? কৈফিয়ৎ দেন নাই বলিয়াই এই দম্পতীকলহের সুন্দর চিত্র নিজের অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যে অনন্যসাধারণ স্থান অধিকার করিয়া আছে।

দেবী-চৌধুরাণীর ন্যায় আনন্দমঠেরও ভিত্তি যে স্থানীয় ও সাময়িক প্রকৃতিকেই করা হইয়াছে, এবং সেই কারণে ইহারও অঙ্গে স্বাভাবিকতা যে ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না। কিন্তু দেবী চৌধুরাণীতে স্বাভাবিকতা যতটা পূর্ণভাবে অভিব্যক্ত হইয়াছে আনন্দমঠে তাহা ততটা পূর্ণভাবে অভিব্যক্ত হয় নাই।

আনন্দমঠে যে সকল স্বাভাবিক চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে, তন্মধ্যে তদানীন্তন ইংরাজ কর্ম্মচারী কর্তৃক যুদ্ধসম্বন্ধীয় communique প্রস্তুত করিবার অদ্ভুত ক্ষমতায় যে সহজ ও সরল চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে, তাহা যেমন স্বাভাবিক, তেমনই কৌতুক-জনকও বটে। কাপ্তেন টমাসের রসদ যাইতেছে; দেখিয়া স্থানীয় ডোম-বাগ্দীর দল লোভ সামলাইতে না পারিয়া সেই রসদের গাড়ী আক্রমণ করিল, "কিন্তু কাপ্তেন টমাসের

সিপাহীদের হস্তস্থিত বন্দুকের দুই চারিটী গুঁতা খাইয়া ফিরিয়া আসিল। কাপ্তেন টমাস তৎক্ষণেই কলিকাতায় রিপোর্ট পাঠাইলেন যে, আজ ১৫৭ জন সিপাহী লইয়া ১৪৭০০ বিদ্রোহী পরাজয় করা গিয়াছে। বিদ্রোহীদের মধ্যে ২১৫৩ জন মরিয়াছে আর ১২৩৩ জন আহত হইয়াছে। ৭ জন বন্দী হইয়াছে। কেবল শেষ কথাটী সত্য।" ইহা ব্যতীত এত ছোট ছোট স্বাভাবিক চিত্র গ্রন্থের অঙ্গ ছাইয়া আছে যে, খুঁটিয়া খুঁটিয়া সেই চিত্রগুলি বাহির করাই কঠিন—সমস্ত গ্রন্থখানি পড়িলেই সেই চিত্রগুলির স্বাভাবিকতা সহজেই দৃষ্টিগোচর হয়।

গ্রন্থকার এই উপন্যাসে যেমন বহুল পরিমাণে স্বাভাবিকতার ছাপ দিয়াছেন, সেইরূপ ইহার অঙ্গে কতকগুলি অস্বাভাবিকতার দৃষ্টান্তও রাখিয়া দিয়াছেন। গ্রন্থের প্রথমেই গ্রন্থকার কল্যাণীকে হাতিয়ারসহ বাহির করিয়াই অস্বাভাবিকতা আনিয়া ফেলিয়াছেন। দেশের সেই অশান্তিপূর্ণ অবস্থার পক্ষেও ইহা স্বাভাবিক মনে হয় না। ইহা অস্বাভাবিক বলিয়াই, যখন কয়েকজন ডাকাত অসহায় ও উপবাসে জীর্ণশীর্ণ কল্যাণীকে ধরিল, তখন কল্যাণী সেই হাতিয়ার ব্যবহার করিল কি না, গ্রন্থকার তাহার উল্লেখ পর্য্যন্ত করিতে বিস্মৃত হইলেন। তাহার পর, সিপাহীদের সঙ্গে কলহে ভবানন্দকে কোন সাহায্য না করিয়া কল্যাণীর স্বামী মহেন্দ্রের দূরে সরিয়া দাঁড়ানো এবং পরে ভবানন্দকে ডাকাতি করার বিরুদ্ধে বক্তৃতা

দেওয়া অস্বাভাবিক মনে হয়। মহেন্দ্র বাহির হইল বন্দুক ও গুলি লইয়া—আত্মরক্ষার জন্য; তাহাকে ধরিল—সিপাহীরা; সেই সিপাহীদের হাত হইতে তাহাকে রক্ষার উপায় করিলেন—ভবানন্দ। এই অবস্থায় ভবানন্দকে ডাকাতির বিরুদ্ধে বক্তৃতা দিবার জন্য মহেন্দ্রের খাড়া হওয়া, সময় ও অবস্থা বিবেচনায় অসঙ্গত বলিয়াই মনে হয়।

এস্থলে যেমন মহেন্দ্রের ব্যবহার অসঙ্গত দেখিতেছি, অপর এক স্থলে ভবানন্দের গুরু সত্যানন্দের ব্যবহারও সেইরূপ অসঙ্গত দেখি। নিষ্কাম কর্ম্মের ভিত্তিতে আত্মবলিদানপূর্ব্বক সনাতন ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠাই হইল আনন্দমঠের মূলমন্ত্র। এখন, সিপাহীরা যখন সত্যানন্দ ও মহেন্দ্রকে বাঁধিয়া লইয়া যাইতেছে, সে সময়ে মহেন্দ্র যখন সত্যানন্দকে বলিল "আপনি সহায়তা করিলে আমি এই সিপাহীদিগকে পরাস্ত করিতে পারি," তখন সত্যানন্দ তদুত্তরে মহেন্দ্রকে বলিলেন "আমার এই প্রাচীন শরীরে বল কি—আমি যাঁহাকে ডাকিতেছিলাম, তিনি ভিন্ন আমার আর বল নাই—তুমি, যাহা অবশ্য ঘটিবে,' তাহার বিরুদ্ধাচরণ করিও না। আমরা এই পাঁচজনকে পরাভূত করিতে পারিব না। চল, কোথায় লইয়া যায় দেখি। জগদীশ্বর সকল দিক রক্ষা করিবেন।" 'অবশ্য আমরা দুইজন এই পাঁচজনকে পরাভূত করিতে পারিব না' এই যুক্তিতে সত্যানন্দ মহেন্দ্রকে বিরোধপ্রদর্শনে নিরস্ত করিলে আমাদের কোন কথাই ছিল না।

কিন্তু তিনি ঐ যে বলিলেন "তুমি, যাহা অবশ্য ঘটিবে, :তাহার বিরুদ্ধাচরণ করিও না," এই অদৃষ্টবাদসমর্থক যুক্তি আনন্দমঠের সমস্ত প্রাণের বা geniusএর বিরুদ্ধ।

গ্রন্থের আরম্ভে যেমন দেখিলাম, গ্রন্থের শেষাশেষিও সেইরূপ দেখি, অস্বাভাবিক দুএকটী ঘটনা সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। সত্যানন্দ নদীতীরে বৃহৎ কাননে স্বীয় শিষ্য "সন্তান"গণের এক বৃহৎ সভা আহ্বান করিয়াছেন। "সন্তান"গণ দেশহিতৈষী এবং দেশের লোকেরা "সন্তান"দের হিতৈষী। সহস্র সহস্র সন্তান মিলিত হইয়াছে, এমন সময়ে সহসা ইংরাজেরা সন্তানগণকে আক্রমণ করিল। সত্যানন্দ চারিদিকে গুপ্তচর রাখিয়াছেন—কোথায় ভবানন্দ কি করিতেছেন, জীবানন্দ কি করিতেছেন, তাহার সংবাদ রাখিতেছেন; আর এত বড় জনতাকে একটা বৃহৎ ইংরাজসৈন্য আক্রমণ করিতে আসিল, অথচ সত্যানন্দ তাহার কোনই সংবাদ পাইলেন না—ইংরাজসৈন্য সম্বন্ধে সত্যানন্দের গুপ্তচরেরা সহসা অদৃশ্য হইয়া গেল—নিতান্তই অসম্ভব!

ইতি শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর কথিত "আর্ট ও সাহিত্য"
কথায় আর্টের প্রাণ—বঙ্কিমচন্দ্রে বিষয়ক
দ্বাদশ কথা সমাপ্ত।

ও৩ঁম

ত্রয়োদশ কথা—আর্টের প্রাণ—বঙ্কিমচন্দ্রে।

(খ) চন্দ্রশেখর ও বিষবৃক্ষে।

বঙ্কিমচন্দ্রের দেবী চৌধুরাণী ও আনন্দমঠ যেমন সমধিক প্রকৃত গ্রন্থ, চন্দ্রশেখর ও বিষবৃক্ষ তেমনই জনপ্রিয় গ্রন্থ। ইহার কারণ এই যে, এই দুই গ্রন্থে এমন কয়েকটী এদেশের প্রকৃতিসিদ্ধ সুন্দর গার্হস্থ্য-চিত্র আছে, যাহার তুলনা নাই। আবার, এমনও কয়েকটী চিত্র আছে, সেগুলি যেমন স্বাভাবিক, তেমনই সেগুলি অভিনয়ে বড়ই সুন্দর দেখায়।

চন্দ্রশেখরে প্রতাপ ও শৈবলিনীর সাঁতারের ঐ যে দুইটী চিত্র দেওয়া হইয়াছে—অভিনয়ে সেগুলি কি সুন্দর দেখায়!—সেই জল তকতক করিতেছে, আর তাহাতে দুইটী বালকবালিকা সাঁতার দিতেছে—কি সুন্দর! কিন্তু এই দুইটী চিত্রের মধ্যে দ্বিতীয়টী যেমন সুন্দর, তেমনই স্বাভাবিক। প্রতাপ ইংরাজ কর্ত্তৃক নৌকায় অবরুদ্ধ হইয়া আছে; শৈবলিনী পাগল সাজিয়া প্রতাপের নিকটে যাইবার অনুমতি পাইল। তাহার পরে, কোন প্রকারে শৈবলিনী কৌশলে প্রতাপকে বন্ধনমুক্ত করাইল। সহসা উভয়েই নদীতে ঝাঁপাইয়া পড়িল এবং ইংরাজদিগের হস্ত হইতে উভয়েই মুক্তিলাভ করিল। ইহাতে কিছুমাত্র অস্বাভাবিকতা আছে বলিয়া মনে হয় না। এই চিত্রটী যেমন স্বাভাবিক, তেমনি সুদৃশ্য।

কিন্তু গ্রন্থকার গ্রন্থের প্রারম্ভেই যে সাঁতারের চিত্র দিয়াছেন, তাহা অভিনয়ে দেখিতে সুন্দর হইলেও অস্বাভাবিক—ঐ বহিঃসৌন্দর্য্যের জন্যই উহার অস্বাভাবিকতাটুকু অনেক সময়ে আমাদের চক্ষে পড়ে না। আট নয় বৎসরের, নেহাত পক্ষে অনূর্দ্ধ বারো বৎসরের শৈবলিনীকে প্রতাপের সঙ্গে গ্রন্থকার যে প্রকার প্রেমে হাবুডুবু খাওয়াইয়াছেন, তাহা কিছুতেই সঙ্গত নহে। এই একরত্তি ব্রাহ্মণকন্যা "দুধের মেয়ে" প্রেমের জ্বালায় জর্জ্জরিত হইয়া শেষে কিনা নদীতে জীবন বিসর্জ্জন দিতে উদ্যত! ইহার অস্বাভাবিকতার মাত্রা একটু ছাপাইয়া উঠিয়াছে মনে হয়। তাহার পর, শৈবলিনী ও প্রতাপ উভয়েই সন্তরণপটু; এই অবস্থায় যখন শৈবলিনী ডুবিল না, সাঁতার দিয়া কূলে উঠিল, তখন প্রতাপের 'মনে করিলাম আর ডুবিয়া মরিলাম' কার্য্যটা বড়ই অসম্ভব। কিন্তু প্রকাশ্য অভিনয়ে অথবা মনের কল্পনায় ঐ যে আমরা দেখি—নদীর জল কুলুকুলু ধ্বনিতে গান গাহিতে গাহিতে কোন্ অজানা সাগরপানে চলিয়াছে, আর সহসা শৈবলিনী ও প্রতাপ পরস্পরের আলিঙ্গনে আবদ্ধ হইয়া জলে ডুবিতে উদ্যত-মূর্ত্তিতে আবির্ভূত—তাহাতেই আমরা মুগ্ধ হইয়া উভয়ের বয়স ও অবস্থার তুলনায় ঘটনার অসামঞ্জস্যের প্রতি দৃষ্টি করি না।

চন্দ্রশেখরের প্রারম্ভভাগে দলনী-বেগমের সহিত মীর-

কাসেমের কথোপকথনটী কি স্বাভাবিক ও দুঃখের আবেগে পূর্ণ! অন্যান্য বেগমের নিকট মীরকাসেম কামবৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য যাইতেন, কিন্তু দলনীবেগমের নিকট হৃদয়ের আদানপ্রদান করিয়া একটু সহজ হইয়া হাঁফ ছাড়িতে চাহিতেন। দলনীর নিকট নবাব সমস্ত হৃদয় খুলিয়া দিতেন। মীরকাসেম দলনীর নিকট তদানীন্তন ইংরাজশাসনের বিরুদ্ধে কি করুণ ভাষায় নালিস করিতেছেন—"তাঁহারা (ইংরাজেরা) বলেন, রাজা আমরা, কিন্তু প্রজাপীড়নের ভার তোমার উপর; তুমি আমাদের হইয়া প্রজাপীড়ন কর"। কি সরল ও স্বাভাবিক ভাব—স্বামী ও স্ত্রীর হৃদয়ের ভালবাসা থাকিলে নিজেদের বিপদ-আপদের কথা সুখদুঃখের কথা এমনিভাবেই তো বাহির হয়। গ্রন্থকার এই গ্রন্থে একটী মঙ্গলভাব এমন মোলায়েমরূপে অন্তঃপ্রবিষ্ট রাখিয়াছেন এবং ইহার অধিকাংশ চিত্র, বিশেষত গ্রন্থের শেষ অংশ এতই মিষ্ট ও স্বাভাবিক করিয়া তুলিয়াছেন যে, ইহার ভিতরকার অসঙ্গত অংশগুলির অস্বাভাবিকতা আমরা সহজে দেখিতে পাই না।

বিষবৃক্ষে আমরা বিস্তর সুন্দর স্বাভাবিক চিত্র ছড়ানো দেখিতে পাই। গ্রন্থের প্রথমেই যে পথের চিত্র দেওয়া হইয়াছে, তাহা কি স্বাভাবিক। যাঁহারা নৌকা করিয়া জলপথে কখনও কোথাও গিয়াছেন, তাঁহারাই ইহার স্বাভাবিকতা কতদূর তাহা উপলব্ধি করিতে পারিবেন। নগেন্দ্রের বাড়ীর

বর্ণনাও নিখুঁৎ—মফঃস্বলের জমীদারের বাড়ী আমরা চক্ষে দেখিতেছি বলিয়া মনে হয়। শ্রীশচন্দ্র ও কমলমণির চিত্র খুবই স্বাভাবিক হইয়াছে; এমন কি, সময়ে সময়ে সংশয় আসে যে, সূর্য্যমুখী অথবা কমলমণি, কাহার চিত্র বেশী স্বাভাবিক হইয়াছে।

গ্রন্থে স্বাভাবিকতা যথেষ্ট থাকিলেও, আমাদের মতে বঙ্কিমচন্দ্রের উপরে আলোচিত কয়েকটী গ্রন্থ অপেক্ষা বিষবৃক্ষে অস্বাভাবিকতার পরিমাণ অনেক বেশী। ভাষার সৌন্দর্য্য ও রচনার কৌশলে গ্রন্থের অস্বাভাবিকতাগুলি সহজেই আমাদের দৃষ্টি এড়াইয়া যায়। গ্রন্থকার এই গ্রন্থের অনেক স্থলে যেমন স্বাভাবিক ভাব রক্ষা করিতে পারেন নাই, সেইরূপ অনেকস্থলে অনাবশ্যক ও অপ্রাসঙ্গিকভাবও যথেষ্ট আনিয়া ফেলিয়াছেন। সেই সকল অপ্রাসঙ্গিকতার সঙ্গে সঙ্গে অস্বাভাবিকতাও স্বভাবতই আসিয়া পড়িয়াছে। আধুনিক উপন্যাস যে আপনাপনি জন্মগ্রহণ করে নাই, বঙ্কিমচন্দ্র যে বিলাতী উপন্যাসেরই আদর্শে বাঙ্গালা উপন্যাসের জন্মদান করিয়াছেন, তাহা আশা করি, কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবে না। তাঁহার ন্যায় ক্ষমতাশালী লেখক তাঁহার উপন্যাসগুলিতে বিলাতী ছাঁদ বিলাতী ভাব প্রবেশের অনুমতি দিবার বিরুদ্ধে প্রাণপণ চেষ্টা করিলেও সেই সকল অস্বাভাবিক ভাব যে একেবারেই প্রবেশ করে নাই তাহা বলিতে পারি না। তাঁহার গ্রন্থোক্ত দেশের প্রকৃতি-

বিরুদ্ধ বিকৃতভাবই বর্ত্তমান ঔপন্যাসিকদিগের গ্রন্থে বিকৃত পাশ্চাত্য ভাব প্রবেশ করাইবার মূল।

কুন্দনন্দিনীর পিতা যখন মারা যান, তখন কুন্দের বয়স তেরো বৎসর এবং নগেন্দ্রের বয়স ৩০ বৎসর। কুন্দকে নগেন্দ্র নিজের ভগ্নী কমলমণির বাড়ীতে রাখিল। এই সময়ে নগেন্দ্র তাহার বন্ধু হরদেব ঘোষালকে কুন্দ সম্বন্ধে লিখিতেছে—"প্রথম যৌবনসঞ্চারের অব্যবহিত পূর্ব্বেই যেরূপ মাধুর্য্য এবং সরলতা থাকে, পরে তত থাকে না। এই কুন্দের সরলতা চমৎকার; সে কিছুই বুঝে না। আজিও রাস্তার বালকদিগের সহিত খেলা করিতে ছুটে; আবার বারণ করিলেও ভীতা হইয়া প্রতিনিবৃত্ত হয়"। এই প্রকার মাধুর্য্য ও সরলতার চিত্র পড়িয়া কুন্দকে তো একটী নিতান্ত ছোট "দুধের মেয়ে" বলিয়া আদর করিতে ইচ্ছা হয়। বিশেষত নগেন্দ্র যে অবস্থায় কুন্দকে উদ্ধার করিয়াছিল, তাহাতে তাহার মন কুন্দের প্রতি স্নেহরসে গলিয়া যাওয়াই উচিত ছিল। তাহা দূরে যাক, এই প্রকার মাধুর্য্য ও সরলতা দেখিয়া একটী ত্রিশ বৎসরের (কুন্দ অপেক্ষা ১৭ বৎসরের বড়) সংযতচরিত্র ও সূর্য্যমুখীর ন্যায় সতীর প্রেমে আচ্ছাদিত যুবক—নগেন্দ্রের মনে সেই কুন্দের কুমারীভাবের প্রতি, রমণীর মাতৃত্বের প্রতি একটা গভীর শ্রদ্ধা আসিবার পরিবর্ত্তে তাহাকে নাকি এমন এক কামভাব ঘিরিয়া ফেলিল যে, সে অনেক দিন পর্য্যন্ত

তাহার প্রভাব অতিক্রম করিতে পারিল না; এমন কি, কুন্দের আত্মহত্যার পূর্ব্বে তাহার সেই মোহের ঘোর কাটিল না! এই চিত্র কত বড় অস্বাভাবিক তাহা পাঠকেরাই বিচার করিবেন। তার পর, কুন্দ জানে যে, সে সম্ভ্রান্ত কায়স্থ হিন্দুর ঘরের মেয়ে। তাহার বয়স তেরো বৎসর। তাহাতে আবার তাহারই ক্রোড়ে বলিতে গেলে তাহার পিতা দুঃখকষ্টের সঙ্গে ভীষণ সংগ্রাম করিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। এ অবস্থায় দিনকয়েক কমলমণির বাড়ী আসিয়াই কুন্দের রাস্তার বালকদিগের সহিত খেলা করিতে ছুটিয়া যাইবার প্রবৃত্তি অত্যন্ত বাড়িয়া উঠিল—এদেশের পক্ষে এই চিত্রটী যে একটুও স্বাভাবিক হইয়াছে তাহা বলিতে পারি না। আসল কথা—এইখানে বঙ্কিমবাবুর মনে যে বিলাতী ভাব ওলটপালট খাইতেছিল, তাহা বেশ বোঝা যায়। ঐ যে কুন্দকে নগেন্দ্র একবার চোখের দেখা দেখিল আর একেবারে প্রেমে উন্মত্ত হইয়া পড়িল; ঐ যে "teens"এর পূর্ব্বে একটা অতিমাত্র বালভাব এবং তাহার ফলে রাস্তার বালকদিগের, বিশেষত কলিকাতার রাস্তার বালকদিগের, সহিত খেলা করিতে "ছুটিয়া যাওয়ার" প্রবৃত্তি—এ সমস্তই আমাদের দেশের সম্পূর্ণই প্রকৃতিবিরুদ্ধ, এগুলি সমস্তই বিলাতী আমদানি বলিয়াই মনে হয়।

দেবেন্দ্রের বৈষ্ণবীর সাজে জ্ঞাতিশত্রু নগেন্দ্রের অন্তঃপুরে গিয়া কুন্দকে দেখা—ইহাতে যেমন মঙ্গলভাবের বিশেষ অভাব

দেখা যায়, সেইরূপ ইহা নিতান্ত ছেলেমানুষী অস্বাভাবিক কল্পনা বলিয়াও মনে হয়; আর মনে হয়, বুঝি বা এটীও বিলাতী কোন চিত্র হইতে ধার করা। দেবেন্দ্র যে বৈষ্ণবী সাজিয়া গ্রামে গ্রামে চলাইতে যায়, এবং নগেন্দ্রেরও বাড়ীতে যে যাতায়াত করে, তাহা গ্রামবাসী সকলেই জানিয়াছে—এ কথা দেবেন্দ্রের মাতুলপুত্র সুরেশ স্পষ্টই বলিয়া দিয়াছে; তখন ইহা যে নিতান্তই অসম্ভব যে, নগেন্দ্র সে কথা একেবারেই শুনে নাই এবং শুনিয়াও জ্ঞাতিশত্রুর প্রতি কোন উচ্চবাচ্য না করিয়া নিতান্ত গোবেচারার ন্যায় নীরব রহিল!

এই প্রকার ছেলেমানুষী অস্বাভাবিকতার আরও একটী দৃষ্টান্ত দেখিতে পাই। হীরা দাসীর ঘরে কুন্দ পলাইয়া আশ্রয় লইয়াছে। সেইখানে কুন্দ আছে কিনা, হীরার "গঙ্গাজল" মালতী গোয়ালিনীর এইটুকু জানা হইল আবশ্যক। কিন্তু সেই প্রয়োজনসিদ্ধির জন্য মালতী স্বাভাবিক ও সঙ্গত কোন উপায় অবলম্বন না করিয়া এক অদ্ভুত গোছের ফাঁদ পাতিল। মালতী হীরারই একটা হরিণশিশুকে হীরার অজ্ঞাতে ছাড়িয়া দিল; তখন হীরা তাহাকে ধরিতে ছুটিল। তখন মালতী একবার "ও হীরে! ও হীরে! ও গঙ্গাজল!" বলিয়া কাঁদিবার ভাণ করিল, আর একবার "কুন্দ ঠাকরুণ! কুন্দ! শীঘ্র বাহির হও!" বলিয়া চেঁচাইয়া উঠিল। হরিণশিশু নিশ্চয়ই বেশী দূরে যায় নাই, কাজেই হীরাও নিশ্চয়ই বেশী দূরে

ছিল না। হীরা যদি মালতীর "ও হীরে" চীৎকার শুনিতে পাইয়া থাকে, তবে তাহার পক্ষে "কুন্দ ঠাকরুণ" চীৎকারও না শোনা অসম্ভব। আর, ঐ প্রকার চেঁচামেচির পর কুন্দের মনে একটীবারও সন্দেহ জাগিল না যে, হীরা এই সমস্ত মালতীর কাজ শুনিয়াছে ও দেখিয়াছে? ভয়ে হউক ভাল-বাসায় হউক, কুন্দ যে হীরার নিকট এই ঘটনার কথা একটীবারও উল্লেখ করিল না—ইহা খুবই অস্বাভাবিক মনে হয়।

আবার গ্রন্থের শেষেও একটী ছেলেমানুষীর দৃষ্টান্ত আছে। কুন্দ যখন বিষ খাইয়া মৃত্যুকে বন্ধুবোধে আলিঙ্গন করিয়াছে, তখন নগেন্দ্র গদ্গদকণ্ঠে বলিতেছে—"এ কি এ কুন্দ! তুমি কি দোষে ত্যাগ করিয়া যাইতেছ"? এই কথাগুলি পড়িলে উপহাসের সহিত বলিতে ইচ্ছা হয় না কি—'আহা! ছেলেটী কি ভালমানুষ, কি সাধু ও সরল'! এতদিন নগেন্দ্র একবার সূর্য্যমুখীকে ত্যাগ করিয়া কুন্দের জন্য ছটফট করিতে লাগিল; এখন আবার কুন্দকে ত্যাগ করিয়া সূর্য্যমুখীর জন্য পাগল! এই অবস্থায় বিষভক্ষণে মৃত্যুর ক্রোড়ে শয়ান কুন্দকে মৃদুমধুর-কণ্ঠে "একি এ কুন্দ! তুমি কি দোষে ত্যাগ করিয়া যাইতেছ" এই প্রশ্ন যেন নেহাত আবদেরে (spoilt) ছেলের ন্যাকামী অথবা রঙ্গমঞ্চে অভিনয়ের জন্য শিক্ষাপ্রাপ্ত নায়কের অস্বা-ভাবিক কাতরোক্তির মুখস্থ বুলি বলিয়া মনে হয়—নগেন্দ্রের

ন্যায় যুবকের উপযুক্ত নহে। কুন্দের এই পরিণাম দেখিয়া নগেন্দ্রের নীরব অনুশোচনাই সমধিক সঙ্গত ও শোভন হইত।

বঙ্কিমবাবুর উপরোক্ত কয়েকটী গ্রন্থ আলোচনা করিতে গিয়া একটী কৌতুকাবহ ব্যাপার আমাদের চক্ষে পড়িয়াছে—সেটী একটু অস্বাভাবিক বলিয়াও মনে হয়। গ্রন্থগুলির প্রত্যেকটীতেই ছোটবড় নায়িকার পলায়নের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। বঙ্কিমবাবুর নিকটে নায়িকাদের পলায়ন ব্যাপারটা যেন খুব সহজ ও স্বাভাবিক—একটা fashionএ—দাঁড়াইয়া গিয়াছে। দেবীচৌধুরাণীতে প্রফুল্ল পলায়ন করিল। আনন্দমঠে শান্তির মত এক ব্রাহ্মণপণ্ডিতের মেয়ে যৌবনলক্ষণ দেখা দিবার পূর্ব্বেই অর্থাৎ অনধিক দশ এগারো বৎসর বয়সেই কাহাকেও না বলিয়া জঙ্গলে পলায়ন করিল; কেবল তাহাই নহে—সেই জঙ্গলে আবার কাপড় রং করিতে লাগিল এবং পরিণামে এক অজানা সন্ন্যাসীর দলে মিশিয়া গেল। তদানীন্তন দেশকালের অশান্তিপূর্ণ অবস্থার কথা বিবেচনা করিলেও এই পলায়ন আমাদের চক্ষে খুবই অস্বাভাবিক ঠেকিতেছে। শান্তি চলিয়া গেল, অথচ তাহার শ্বশুরবাড়ীতে এতটুকু সাড়াশব্দ উঠিল না—নিকটবর্ত্তী জঙ্গলে খোঁজ করিবার একবার নামগন্ধও উঠিল না? তারপর, শান্তি সন্ন্যাসীবেশে তাহার স্বামীর নিকট যাইবার জন্য গৃহের বাহির হইয়া পড়িলে, তাহার মুখে গ্রন্থকার

যে গানটী দিয়াছেন, তাহাও আমাদের নিকট বড়ই অপ্রাসঙ্গিক ও অস্বাভাবিক মনে হয়। চন্দ্রশেখরে শৈবলিনী পলায়ন করিল। বিষবৃক্ষে সূর্য্যমুখী ও কুন্দনন্দিনী উভয়েই পলায়ন করিল। পলায়ন-ব্যাপার গ্রন্থকারের এতই প্রিয় ছিল যে, তিনি অনেকস্থলে নায়কদিগকেও পলায়ন করাইতে ছাড়েন নাই। এইরূপ পলায়নব্যাপারের ফলে গ্রন্থগুলিতে বেশ একটু অস্বাভাবিকতা আসিয়া পড়িয়াছে।

ইতি শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর কথিত "আর্ট ও সাহিত্য" কথায় আর্টের প্রাণ—বঙ্কিমচন্দ্রে বিষয়ক ত্রয়োদশ কথা সমাপ্ত।

ॐ

চতুর্দ্দশ কথা—আর্টের প্রাণ—রবীন্দ্রনাথে।

বৌঠাকুরাণীর হাট ও রাজর্ষিতে।

রবীন্দ্রনাথের বৌঠাকুরাণীর হাট এবং রাজর্ষি, এই দুই গ্রন্থেও স্বাভাবিকতা পরিব্যাপ্ত। বৌঠাকুরাণীর হাটে যুবরাজের পত্নী সুরমা স্বামীর বিপদ আশঙ্কা করিয়া তাঁহার ননদ বিভাকে উদ্দেশ করিয়া বলিতেছেন—"আমার বিশ্বাস, সংসারে যাহার কেহই সহায় নাই, নারায়ণ তাহার অধিক সহায়। হে প্রভু, তোমার নামে কলঙ্ক না হয় যেন, এ বিশ্বাস আমার ভাঙ্গিয়ো না।" স্বামীর বিপদের আশঙ্কা ঘটিলে স্ত্রীলোকের পক্ষে ইহা অপেক্ষা স্বাভাবিক কথা আর কি হইতে পারে? সেইপ্রকার রাজর্ষিগ্রন্থে সহোদর ভাই যখন বিদ্রোহী হইয়া ভূতপূর্ব্ব পুরোহিতের পরামর্শে ভাইয়ের রাজ্য আত্মসাৎ করিবার জন্য উপস্থিত হইলেন, তখন রাজা গোবিন্দমাণিক্য তাঁহার নবনিযুক্ত পুরোহিতকে এই কয়টী কথা বলিলেন—"আমি রাজত্ব করিবার যোগ্য নহি, তাহারই সকল লক্ষণ প্রকাশ পাইতেছে। সেইজন্য আমার প্রতি প্রজাদের বিশ্বাস নাই, সেইজন্যই দুর্ভিক্ষের সূচনা, সেই জন্যই যুদ্ধ। রাজ্য পরিত্যাগের জন্য এ সকল ভগবানের আদেশ।" চারিদিকে অমঙ্গল ঘনাইতে দেখিয়া শান্তশিষ্ট রাজার মুখে কথাগুলি খুবই স্বাভাবিকভাবে বাহির হইয়াছে। এই দুইখানি উপন্যাসের প্রায় সকল চরিত্রই, দু'এক স্থলে একআধটু অতিরঞ্জিত হইলেও, বেশ স্বাভাবিকভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে।

বৌঠাকুরাণীর হাটের রাজা প্রতাপাদিত্য, তাঁহার পিতৃব্য বসন্তরায়, রাজপুত্র যুবরাজ উদয়াদিত্য, যুবরাজপত্নী সুরমা, যুবরাজভগ্নী বিভা, বিভার শ্বশুরবাড়ীর বৃদ্ধপুরাতন কর্ম্মচারী রামমোহন; এবং রাজর্ষির রাজা গোবিন্দমাণিক্য, পুরোহিত রঘুপতি ও বিহ্বলণ, জয়সিংহ, আর সেই বালক ও তাহার ভগ্নী প্রভৃতির চিত্র যে কতদূর স্বাভাবিক হইয়াছে, তাহা গ্রন্থ দুইটী আদ্যোপান্ত না পড়িলে সম্যক উপলব্ধি হইবে না। বৌঠাকুরাণীর হাটে বৃদ্ধ বসন্তরায় যে তুলিতে অঙ্কিত হইয়াছেন, সে তুলির তুলনা নাই। মনে হয় যেন, চিত্রকর সম্মুখে কোন প্রত্যক্ষ আদর্শ রাখিয়া এই বুড়া দাদামহাশয়কে আঁকিয়াছেন—ইহা এতই স্বাভাবিক হইয়াছে! প্রতাপাদিত্য ক্রোধান্বিত হইয়া নিজের জামাতাকে নিহত করিবার আদেশ দিয়াছিলেন। সেই আদেশ বসন্তরায়ের কর্ণগোচর হইলে তিনি তাহা বিশ্বাসই করিতে পারেন নাই—তিনি স্তম্ভিতহৃদয়ে আপন মনে "তাহা কি সম্ভব" বকিতে বকিতে একেবারেই প্রতাপাদিত্যের সম্মুখে উপস্থিত হইয়াই বলিয়া উঠিলেন—"বাবা প্রতাপ, তাহা কি সম্ভব?" বুড়া দাদামহাশয়ের মর্ম্মাহত ভাবের কি সুন্দর ও স্বাভাবিক চিত্র! ইহার ভিতরে একটী গভীর মনস্তত্ত্ব—বুড়া মানুষের মর্ম্মাহত হৃদয়ের ভাব—পরিস্ফুট হইয়া পড়িয়াছে।

বঙ্কিমচন্দ্র এবং রবীন্দ্রনাথ, উভয়েই নিজ নিজ উপন্যাসের

ভিত্তি করিয়াছেন সত্য প্রকৃতিকে। কিন্তু বঙ্কিমবাবু সেই প্রকৃতির বহির্বিকাশকেই, প্রকৃতির বাহ্যিক আকারকেই বেশী ফুটাইতে চেষ্টা করিয়াছেন; রবীন্দ্রনাথ প্রকৃতির অন্তর্বিকাশকেই, প্রকৃতির কার্য্যসমূহ মানবের অন্তরতম প্রদেশের যে সকল চিন্তার পরিণামে ভাল-মন্দ বাহ্যিক আকার ধারণ করে, সেই সকল চিন্তাকেই পরিস্ফুটভাবে ব্যক্ত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। এইভাবে মনটাকে একেবারে উল্টাইয়া ফেলিয়া মনস্তত্ত্ব ব্যক্ত করিবার চেষ্টা বাঙ্গালা উপন্যাসে বোধ হয় রবীন্দ্রনাথই সূত্রপাত করেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার বৌঠাকুরাণীর হাট এবং রাজর্ষিতে এই মনস্তত্ত্ব ব্যক্ত করিবার কার্য্যে অকৃতকার্য্য হইয়াছেন বলিয়াও মনে হয় না। আমাদের বিশ্বাস, তিনি তাঁহার এই কার্য্যে খুবই স্বাভাবিকতার ছাপ দিতে পারিয়াছেন।

প্রতাপাদিত্য তাঁহার পুত্রের অপরাধে দুইটী ভৃত্যের বেতন বন্ধ করিলেন। যুবরাজ গোপনে তাহাদিগকে বৃত্তি দিতে লাগিলেন। তাহা শুনিয়া "প্রতাপাদিত্যের মনে মনে একটু বিশেষ রোষের উদয় হইল। সম্ভবত তিনি নিজেও তাহার কারণ বুঝিতে পারেন নাই, কিন্তু তাহার কারণ এই—'আমি যেন ভারি একটা নিষ্ঠুরতা করিয়াছি, তাই দয়ার শরীর উদয়াদিত্য তাহার প্রতিবিধান করিতে আসিলেন। দেখি, তিনি দয়া করিয়া কি করিতে পারেন; আমি যেখানে নিষ্ঠুর, সেখানে

আর যে কেহ দয়ালু হইবে, এত বড় স্পর্দ্ধা কাহার প্রাণে সয়' ?" এই কয়েকটী কথায় গ্রন্থকার প্রতাপাদিত্যের নিষ্ঠুর অন্তঃপ্রকৃতি কেমন সহজে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন।

ইহার বিপরীতে উদয়াদিত্যের চরিত্র আর একভাবে কেমন সুন্দর ফুটিয়াছে। উদয়াদিত্য স্বীয় সহধর্ম্মিণীকে বলিতেছেন— "এতদিনের পরে আমি যথার্থ আশ্রয় পাইলাম। * * * পূর্ব্বে আমি আপনাকে ঘৃণা করিতাম * * কোন কাজ করিতে সাহস করিতাম না। মন যদি বলিত, ইহাই ঠিক, আত্মসংশয়ী সংস্কার বলিত, উহা ঠিক না-ও হইতে পারে। * * এতদিনের পরে আমার মনে হইল, আমি কিছু, আমি কেহ। এতদিন আমি অগোচরে ছিলাম, তুমি আমাকে বাহির করিয়াছ, সুরমা, তুমি আমাকে আবিষ্কার করিয়াছ; এখন আমার মন যাহা ভাল বলে, তৎক্ষণাৎ তাহা আমি সাধন করিতে যাই। তোমার উপর আমার এমন বিশ্বাস আছে যে, তুমি যখন আমাকে বিশ্বাস কর, তখন আমিও আমাকে নির্ভয়ে বিশ্বাস করিতে পারি"। এই কথাগুলিতে, স্বামী-স্ত্রীর পরস্পরের মধ্যে গভীর প্রেমের প্রতিষ্ঠা হইলে, স্বামী স্ত্রীকে সহধর্ম্মিণী করিয়া তাঁহার উপর অটুট বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারিলে যে অটল গভীর নির্ভর আসে, তাহা কেমন সহজে ব্যক্ত হইয়াছে। ঐ যে নিজেকে আবিষ্কার করিবার কথা, ঐ যে বিবাহের পূর্ব্বে প্রতিপদে নিজের বিচারের প্রতি সংশয়,

এ সমস্তের ভিতর দিয়া মনস্তত্ত্বেরও গভীর তত্ত্ব কেমন সরল-ভাবে বাহির হইবার চেষ্টা করিতেছে।

এই প্রকার মনস্তত্ত্ব ব্যক্ত করিবার কারণেও আবার গ্রন্থ-খানির স্বাভাবিকতা চারিদিকে ফুটিয়া বাহির হইয়াছে। রাজ-মহিষীর চিত্রেও দুইটী মনস্তত্ত্ব প্রকাশ করিয়া তাহাকে কেমন স্বাভাবিক করিয়া তোলা হইয়াছে। রাজমহিষী হইলেনই বা রাজমহিষী—তিনি বাঙ্গালীরই ঘরের মেয়ে তো বটে, এবং বাঙ্গালীরই ঘরের গৃহিণীও তো বটে। কাজেই, বাঙ্গালীর ঘরে সাধারণত যাহা দেখা যায়,—বাড়ীর যেখানকার যে আছে, তাহাদের সকলেরই দোষ 'পরের মেয়ে, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ নিজের পুত্রবধূর' উপর চাপাইতে তিনি সর্ব্বদাই প্রস্তুত। অপরদিকে, যখন জামাই ঘরে আসিলেন, তখন তাঁহার কাছে নিজের মেয়েকে পাঠাইবার জন্য সাজাইবার কি আগ্রহ, কি ব্যগ্রতা—"প্রাতঃকাল হইতে বিভাকে তিনি স্বহস্তে সাজা-ইতে আরম্ভ করিয়াছেন—বিভা বিষম গোলযোগে পড়িয়াছে। কারণ, সাজাইবার পদ্ধতি সম্বন্ধে বয়স্কা মাতার সহিত যুবতী দুহিতার নানা বিষয়ে রুচিভেদ আছে, কিন্তু হইলে কি হয়, বিভার কিসে ভাল হয়, মহিষী অবশ্য তাহা ভাল বুঝেন"।

বিভার শ্বশুরবাড়ীর বৃদ্ধ পুরাতন কর্ম্মচারী রামমোহনের চিত্র কি স্বাভাবিক! বিভা বহুকাল যাবৎ পিতৃগৃহেই আছেন। রামমোহন মধ্যে মধ্যে বিভার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আসিত।

"রামমোহনকে বিভা কিছুমাত্র লজ্জা করিত না। বৃদ্ধ, বলিষ্ঠ, দীর্ঘ রামমোহন যখন 'মা' বলিয়া আসিয়া দাঁড়াইত, তখন তাহার মধ্যে এমন একটা বিশুদ্ধ সরল অলঙ্কারশূন্য স্নেহের ভাব আসিত যে, বিভা তাহার কাছে আপনাকে নিতান্ত বালিকা মনে করিত"। রামমোহন বিভার স্বামী রামচন্দ্রকে কোলে-পিঠে করিয়া মানুষ করিয়াছে—বিভার লজ্জা ও সঙ্কোচের অবকাশ কোথায়? আজকাল বিশ্বাসী বৃদ্ধ পুরাতন ভৃত্যের এমনই অসদ্ভাব ঘটিয়াছে যে, এ যুগের নব্য পাঠকেরা, এই চিত্র যে কতদূর স্বাভাবিক, তাহা উপলব্ধি করিতে পারিবেন কিনা সন্দেহ।

রবীন্দ্রনাথ তাঁহার বৌঠাকুরাণীর হাট এবং রাজর্ষিতে যেমন মানবের প্রকৃতিসিদ্ধ অনেকগুলি সাধারণ মনস্তত্ত্ব সুব্যক্ত করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন, সেইরূপ দুএকটী বিশেষ তত্ত্বেরও সমাবেশ করিয়াছেন, দেখি। মানুষ যে আসন্ন বিপদের পূর্ব্বাভাস পায়, বৌঠাকুরাণীর হাটের শেষে তাহার স্পষ্ট উল্লেখ আছে। যেদিন প্রতাপাদিত্যের প্রেরিত পাঠান কর্ম্মচারী মুক্তিয়ার খাঁ বসন্তরায়কে বধ করিবে, সেইদিন বসন্তরায় যুবরাজ উদয়াদিত্যকে তাঁহার পার্শ্ব ছাড়িয়া যাইতে কত নিষেধ করিলেন—বেশ বোঝা যায় যে, বসন্তরায় নিজের প্রাণের ভিতর একটা আসন্ন বিপদের আশঙ্কা বিশেষরূপে অনুভব করিতেছিলেন। এই তত্ত্বটী সচরাচর সংঘটিত না হইলেও ইহা যে স্বাভাবিক, তাহা কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবে না।

রাজর্ষি গ্রন্থের প্রথমেই দেখি যে, বহিঃপ্রকৃতির সহিত অন্তঃপ্রকৃতির কি প্রকার ঘাত-প্রতিঘাত হয়, তাহাই সুন্দর ব্যক্ত হইয়াছে। ঐ যে রক্ত দেখিয়া একটী ক্ষুদ্র বালিকার অন্তরে সুতীক্ষ্ণ আঘাত লাগিল, এবং সেই আঘাতের ফলে তাহার মৃত্যু পর্য্যন্ত ঘটিল, ইঁহা মনস্তত্ত্বের অন্যতর সহজ কিন্তু গভীর ও বিশিষ্ট সত্য। কি সরল ও সহজভাবে গ্রন্থকার এই তত্ত্বটী ব্যক্ত করিয়াছেন দেখিলে অবাক হইতে হয়।

রাজর্ষি গ্রন্থে আর একটী বিশিষ্ট তত্ত্বের চিত্র প্রদর্শিত হইয়াছে—সেটী মন্দিরের কর্ম্মচারী জয়সিংহের উপর রঘুপতির সম্মোহন শক্তির আশ্চর্য্য প্রভাব। ইংরাজী উপন্যাস "ট্রিলবি" গ্রন্থে এই তত্ত্বটী বিশেষভাবে ব্যক্ত করিবার চেষ্টা হইয়াছে। এই তত্ত্বটী অস্বাভাবিক নহে—মানবের প্রকৃতিসিদ্ধ সহজ সত্য। বাঙ্গালা কোন গ্রন্থে ইতিপূর্ব্বে এই বিষয়টী এই প্রকার বিশেষভাবে উন্মোচিত হইয়াছে কি না জানি না। কিন্তু রাজর্ষিতে একজনের সমুদয় জীবনের উপর অপরের সম্মোহন শক্তির আশ্চর্য্য ক্ষমতা খুব স্বাভাবিকভাবে ব্যক্ত করা হইয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্রের চন্দ্রশেখরে শৈবলিনীকে চন্দ্রশেখর কর্ত্তৃক সম্মোহিত করিবার কথা আছে বটে, কিন্তু তাহা প্রসঙ্গবিশেষে মাত্র—একজনের সমস্ত জীবনকে সম্মোহন শক্তি দ্বারা আচ্ছাদিত করিবার কথা উহাতে স্থান পায় নাই।

বঙ্কিমচন্দ্রের দেবীচৌধুরাণীতে যেমন অস্বাভাবিকতা এত অল্প যে, তাহার বিশেষভাবে উল্লেখ করা আবশ্যক হয় নাই ; সেইরূপ রবীন্দ্রনাথের রাজর্ষিগ্রন্থেও অস্বাভাবিকতা এতই অল্প যে, তাহার আলোচনা নিষ্প্রয়োজন মনে করি। আমাদের মতে, দেবীচৌধুরাণীর ন্যায় রাজর্ষিও আর্ট হিসাবে সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর।

কিন্তু বৌঠাকুরাণীর হাট সম্বন্ধে আমরা সে কথা বলিতে পারি না। উদয়াদিত্যের ভগ্নীপতি রামচন্দ্র রায়ের চিত্র একটু যেন অস্বাভাবিক ও টানাবোনা বলিয়া মনে হয়। রামচন্দ্রের চিত্র ন্যূনাধিক অস্বাভাবিক হওয়াতে ইহার পৃষ্ঠভূমি বা background তাঁহার সভাসদ রমাই ভাঁড়ের চিত্রটীকে আর একটু বেশী অস্বাভাবিক করিতে হইয়াছে। শ্বশুর বা শ্বাশুড়ীকে অপমান করিবার জন্য রামচন্দ্রের ন্যায় ভীরু, প্রতাপাদিত্যের ভয়ে সর্ব্বদা কম্পিতচিত্ত ব্যক্তির পক্ষে রমাই ভাঁড়কে স্ত্রীলোকের সাজে প্রতাপাদিত্যের অন্তঃপুরে পাঠাইয়া দেওয়া বড়ই অসঙ্গত ও বিসদৃশ ঠেকে। বিষবৃক্ষে নগেন্দ্রের অন্তঃপুরে দেবেন্দ্রকে বৈষ্ণবীসাজে পাঠাইবার ন্যায় এই চিত্রটী অস্বাভাবিক ও অশ্লীল বলিতে বোধ হয় কোনই বাধা হইবে না।

রামচন্দ্র শ্বশুরবাড়ী আসিলেন ; শ্বশুর প্রতাপাদিত্য তাঁহাকে যথোচিত সম্মান দিলেন না। গ্রন্থ পড়িয়া বেশ বোঝা

যায় যে, এ বিষয় লইয়া বেশ একটু নাড়াচাড়া আন্দোলন হইয়াছিল, এবং তাহা রামচন্দ্রের স্ত্রী বিভার অজ্ঞাত ছিল না। এই অবস্থায় রামমোহনকে পাইয়া বিভার তাহাকে নিশ্চিন্তমনে "তোদের দেশের গল্প বল্" বলিয়া পা ছড়াইয়া গল্প শুনিতে বসা স্বাভাবিক হইয়াছে বলা যায় না।

ঠিক এইপ্রকার অস্বাভাবিক হইয়াছে প্রতাপাদিত্যের বাড়ীতেই রামচন্দ্রের রামমোহনকে কর্ম্মচ্যুত করিবার আদেশ-প্রদান। রমাই ভাঁড় স্ত্রীবেশে প্রতাপাদিত্যের অন্তঃপুরে গিয়া মহিষীকে অপমান করিতেই, তথায় উপস্থিত রামমোহন তাহাকে ধরিয়া ফেলিয়া অপমান করিল। রামচন্দ্রই রমাই ভাঁড়কে স্ত্রীবেশে পাঠাইবার মূল, তাই প্রতাপাদিত্য রামচন্দ্রের প্রাণ-দণ্ডের ব্যবস্থা করিলেন। সেই দণ্ড শ্রবণ করিয়া উদয়াদিত্যের পরামর্শে রামচন্দ্র প্রাণভয়ে পলাইতেছেন। উদয়াদিত্যের ব্যবস্থায় রামচন্দ্রকে প্রতাপাদিত্যের দুর্গ হইতে উদ্ধার করিবার জন্য রামমোহন দুর্গের বাহিরে অপেক্ষা করিতেছে। এই অবস্থায় রামমোহনকে দেখিবামাত্র 'আজ হইতেই আমি তোমাকে বরখাস্ত করিলাম' বলিয়া পলাইবার পথে রামচন্দ্রের চীৎকার করিয়া উঠা নিতান্তই অসঙ্গত লাগে।

বৃদ্ধ বসন্তরায়ের চিত্র বড় মিষ্ট ও স্বাভাবিক, তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। মধ্যে মধ্যে বিভা ও সুরমা দ্বারা তাঁহার পাকা চুল তুলাইবার ব্যবস্থা বুড়া দাদামহাশয়ের উপযুক্ত বটে; কিন্তু

অবস্থাবিশেষে, যখন প্রতাপাদিত্যের দণ্ডভয়ে সকলে কম্পিতচিত্ত, তখন উহাঁদিগের দ্বারা পাকা চুল তুলাইবার ব্যবস্থা করিয়া সম্পর্কটী ফুটাইয়া তুলিবার চেষ্টা যে বেশ একটু অনুপযোগী হইয়াছে, তাহা অস্বীকার করা যায় না।

বিষবৃক্ষে যেমন আমরা কুন্দনন্দিনীর মৃত্যুতে নগেন্দ্রের ছেঁদো কান্না দেখিয়া আসিয়াছি, রবীন্দ্রনাথের বৌঠাকুরাণীর হাটেও সেইরূপ সুরমার মৃত্যুতে রাজমহিষীর ছেঁদো কান্না দেখিতে পাই। সুরমাকে চিরনির্ব্বাসিত করিবার জন্য এবং "গুণ" করিয়া তাঁহা হইতে তাঁহার স্বামী উদয়াদিত্যের মন চিরবিচ্ছিন্ন করিবার জন্য শাশুড়ীর যে প্রকার ব্যগ্রতা ও আগ্রহ দেখা যায়, তাহাতে সুরমার মৃত্যুতে তাঁহার 'আঃ বাঁচলুম' গোছের আরাম অনুভব করাই স্বাভাবিক; তৎপরিবর্ত্তে তাঁহার ক্রন্দনটা একটু যেন ন্যাকামি বলিয়া মনে হয়।

এইপ্রকারে আমরা দেখিয়া আসিলাম যে, সেকালের উপন্যাসে—বঙ্কিমচন্দ্রেরই বল, আর রবীন্দ্রনাথেরই বল,—আর্টের প্রাণ স্বাভাবিকতা এবং তাহার অভাব অস্বাভাবিকতার যথেষ্ট সংমিশ্রণ আছে। থাকিলেও, মোটের উপর বলিতে পারি, সেকালের উপন্যাসে আর্টের প্রাণ যথেষ্ট পরিমাণেই দৃষ্ট হয়। ইহার কারণ এই যে, সেকালের ঔপন্যাসিকগণ যতদূর

সম্ভব যথার্থ প্রকৃতিকে—প্রকৃতির বিকৃতিকে নহে—তাঁহাদের উপন্যাসের ভিত্তি করিয়াছেন।

ইতি শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর কথিত "আর্ট ও সাহিত্য"
কথায় আর্টের প্রাণ—রবীন্দ্রনাথে বিষয়ক
চতুর্দ্দশ কথা সমাপ্ত।

পঞ্চদশ কথা—আর্টের প্রাণ ও একালের উপন্যাস।

সেকালের উপন্যাসের স্থলে স্থলে অশ্লীলতা ও অস্বাভাবিকতা প্রভৃতি দোষ থাকিলেও মোটের উপর মঙ্গলভাব, শ্লীলতা ও আর্টের প্রাণ স্বাভাবিকতা যে বেশ বজায় আছে, তাহা আমরা আদর্শ হিসাবে বঙ্কিমচন্দ্রের এবং রবীন্দ্রনাথের কয়েকটী উপন্যাস ধরিয়া আলোচনা করিয়া দেখিয়া আসিয়াছি। কিন্তু একালের অনেক উপন্যাসেই ঠিক তাহার বিপরীত দেখি। একালের অনেক উপন্যাসেই প্রকৃতির পরিবর্ত্তে প্রকৃতির বিকৃতিকেই ভিত্তি করা হয় এবং কাজেই অস্বাভাবিকতারই প্রাবল্য দেখা যায়। আবার অস্বাভাবিকতার প্রাবল্যের কারণে শ্লীলতা-অশ্লীলতার বিচারেরও অভাব হইয়া পড়ে—ফলে স্বার্থের প্ররোচনায় অশ্লীলতাই একালের উপন্যাসের অনেকটা অংশ ব্যাপ্ত করিয়া থাকে। একালের উপন্যাসের অনেকগুলিরই আদ্যন্তমধ্যে আর্টের খাতিরে আর্ট এবং প্রত্যক্ষদ্যোতক আর্টের দোহাইয়ে অন্তর্নিগূঢ় একটা প্রচ্ছন্ন অশ্লীল ও অস্বাভাবিক প্রকৃতিবিরুদ্ধ পাশ্চাত্যভাবের স্রোত অনুভূত হইতে থাকে। গ্রন্থকারেরা বুঝিতেই পারেন না যে, তাঁহারা এই প্রকার বিষয়সকল তাঁহাদের গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট করিবার ফলে প্রকৃত আর্টের কতটা অসদ্ভাব ঘটাইতেছেন। তাঁহারা মনস্তত্ত্ব প্রভৃতি নানা তত্ত্বের দোহাই দিয়া কেবল পাশ্চাত্য দেশের

কথার, ভাবের ও ছাঁদের অনুকরণ করেন মাত্র; বিদেশী জিনিষের উপর দেশী ঢংয়ের এক পোঁছ রং বুলাইয়া দেন মাত্র।

এই দেশী ঢংয়ের রং, দেশী ভাবের আবরণ সরাইয়া দেখিলে দেখা যায় যে, একালের অধিকাংশ উপন্যাসেই ঠিক স্বাভাবিক ভাব পাওয়া যায় না। বিকৃতিকে ভিত্তি করিয়া, স্বাভাবিকতা ছাড়িয়া দিয়া যদি একালের ঔপন্যাসিকগণ মনে করেন যে, তাঁহারা তাঁহাদের উপন্যাসের ভিতর দিয়া আমাদের দেশের প্রকৃত জীবনের চিত্র দেখাইতেছেন, তবে তাহা তাঁহাদের মস্ত ভুল। বিজ্ঞান বলে যে, মানবের অভিব্যক্তি-ধারায় মধ্যে মধ্যে মানবের পূর্ব্ববর্ত্তী কোন জীবের আকার আসিয়া দেখা দেয়। ইহাকে atavism বা পরাবর্ত্তন বলে। একালের অনেক উপন্যাসের চিত্রও আমাদিগকে সেই পরাবর্ত্তনের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। প্রকৃত জীবনের চিত্র আঁকিতে গেলে চিত্রগুলিকে স্বাভাবিক করিতেই হইবে। একালের উপন্যাসের পাঠকেরা উপন্যাসগুলির ভাষার সৌন্দর্য্যে, রচনার চাতুর্য্যে অন্ধ হইয়া বুঝিতে না পারিলেও, দুদিন বাদে একটু আলোচনা করিলেই বুঝিতে পারিবেন যে, সেগুলির অধিকাংশ চিত্রই অপ্রকৃত ও অস্বাভাবিক। এই সকল উপন্যাসে যে প্রকার ঘটনাচক্রের সমাবেশ করা হয়, তাহাতে অবশ্য লেখকদিগের "অঘটনঘটনপটীয়সী" দৈবী প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যাইতে পারে বটে, কিন্তু মানুষের ব্যবহারিক জগতে

সেগুলি বড়ই অস্বাভিক ঠেকে। দাসভাব বা slave mentality আমাদের অন্তরে যে কত গভীর খাদ কাটিয়াছে, এবং পাশ্চাত্যদের অনুকরণ আমাদের দেশের যে কি সর্ব্বনাশ করিতে বসিয়াছে, তাহা এই সকল একালের উপন্যাস হইতে স্পষ্ট প্রকাশ পায়।

একালের উপন্যাসে মনস্তত্ত্বের দোহাই দিয়া, "আর্টের খাতিরে আর্ট" প্রভৃতি পাশ্চাত্য বাঁধিবুলির দোহাই দিয়া অধিকাংশ লেখক "স্বাধীন" অর্থাৎ প্রধানত পরকীয়ামূলক প্রেমেরই চিত্র ফুটাইয়া তুলিতে চাহেন, দেখা যায়। কিন্তু কৈ—তাঁহারা তো ঐ সকলের দোহাই দিয়া রমণীর মাতৃত্বে শ্রদ্ধার চিত্র, যাহা বঙ্কিমচন্দ্র দেখাইয়াছেন, অথবা বাৎসল্যের চিত্র, যাহা রবীন্দ্রনাথ রাজর্ষিতে সুন্দররূপে দেখাইয়াছেন—সে সকল চিত্র ব্যক্ত করিবার নামগন্ধও করেন না! প্রত্যুত, ভারতের যথার্থ প্রকৃতি রমণীর মাতৃত্বে শ্রদ্ধাকে পদদলিত করিতে পারিলেই, ভারতের পরম্পরাগত সাধুভাবগুলিকে উপেক্ষা ও অবজ্ঞা প্রদর্শন করিতে পারিলেই একালের অধিকাংশ উপন্যাসলেখক যেন গৌরব অনুভব করেন বলিয়া মনে হয়।

একালের অধিকাংশ ঔপন্যাসিক স্বাধীন প্রেমকে ফুটাইয়া ব্যক্ত করিতে চাহেন—ভালই তো; কিন্তু সেই স্বাধীন প্রেম আমাদের দেশের প্রকৃতির ভিতর দিয়া কি ভাবে গড়িয়া

উঠিতে পারে, তাহা আলোচনা না করিয়া তাঁহারা পাশ্চাত্য ভাবের আদর্শে সেই স্বাধীন প্রেমের প্রণালীকে গড়িয়া তুলিতে চাহেন। স্বাধীন ও পরকীয়ামূলক প্রেম আমাদের দেশে কি ভাবে কতদূর সংযমের ভিতর দিয়া গড়িয়া উঠিতে পারে, 'সংস্কৃত সাহিত্যের অনেক গ্রন্থে তাহার দৃষ্টান্তের অভাব নাই। কিন্তু একালের উপন্যাসে পাশ্চাত্য ভাবকে আদর্শ ধরিবার কারণেই সংযমের পরিবর্ত্তে উচ্ছৃঙ্খল আচার-ব্যবহারকেই স্বাধীন প্রেমের নামে সমর্থন করা হয়।

আমাদের প্রাণের উপর দাসভাবের যে কিপ্রকার হাত-কড়ি পড়িয়াছে, তাহা একালের উপন্যাসে কামভাবের ছড়াছড়ি হইতেই সুস্পষ্ট প্রকাশ পায়। দুই দিবস আলাপ পরিচয় হইল, আর অমনি নায়ক প্রেমের তরঙ্গে নাকানি-চুবানি খাইয়া নায়িকাকে অশ্রাব্য ভাষায় সম্বোধন করিতে লাগিল! শিক্ষক একটী বালিকাকে পড়াইতে আসিল, আর দুইচারি দিবসের ভিতরেই' তাহাদের পরস্পরের মধ্যে প্রেমের আগুন একেবারে জ্বলিয়া—ফুটিয়া—উঠিল, আর ছড়াইয়া পড়িল! এই সকল উপন্যাসে সম্পর্কনির্বিশেষে একটা চঞ্চল মাদকতাপূর্ণ কামভাব পদে পদে আমাদের সম্মুখে দাঁড় করানো হয়। নিতান্ত অল্পবয়স্ক বালকবালিকার মধ্যে ভাইবোনের ভালবাসা হইল, পরস্পরের প্রতি ভাইবোনের উপযুক্ত সম্বোধনও চলিতে লাগিল, কিন্তু হায়! সেই ভাইবোনের

ভালবাসার পরিণতি হইল কামোন্মাদে! এই সমস্ত উপন্যাসে বারো তেরো বৎসরের বালিকাদের মুখ হইতে যে সমস্ত কথা বাহির করা হইয়াছে, সে সমস্ত কথা, কেবল আমাদের দেশের কেন, কোন দেশেরই বালিকার মুখে সচরাচর বাহির হইতে পারে বলিয়া আমরা কল্পনাতেও আনিতে পারি না। সকল দেশেই, বিশেষত প্রাচ্য ভূখণ্ডে দেবর-ভ্রাতৃজায়ার পরস্পরের মধ্যে একটী সুন্দর মধুর স্নেহভাবের প্রতিষ্ঠা আছে। কিন্তু একালের অনেক উপন্যাসে অ-কারণে নিষ্প্রয়োজনে সেই স্নেহ-ভাবকে পূতিগন্ধময় উৎকট কামভাবের পঙ্কিল মূর্ত্তিতে পরিণত করিয়া পাঠকদের সম্মুখে ধরা হয়!

এই সকল চিত্র কি মনস্তত্ত্বের অন্যতর গভীর তত্ত্বের কোন অশ্রুতপূর্ব্ব দৃষ্টান্ত? আমাদের মতে এইপ্রকার চিত্রগুলি বিলাতী নকলনবিশির ফলে বিকৃত মস্তিষ্ক হইতে প্রসূত মনস্তত্ত্বের অশ্রুতপূর্ব্ব দৃষ্টান্ত বটে! এই সকল গ্রন্থকার কেবল কামজ মোহের বিস্তৃত ব্যাখ্যাকেই যেন প্রত্যক্ষদ্যোতক হউক বা অন্য কোন প্রকারের হউক, প্রকৃত আর্ট বলিয়া ধরিতে চাহেন মনে হয়। আমাদের বেশ মনে পড়ে, একবার কোন বালিকা-বিদ্যালয়ের পারিতোষিক-বিতরণ সভায় সভাপতিরূপে এক উচ্চপদস্থ ইংরাজ প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, ভারতরমণীর প্রায় শতকরা নব্বই জন অসতী! এই কথা লইয়া সে সময়ে শিক্ষিতসমাজে মহা আন্দোলন চলিয়াছিল। একালের ঔপ-

ন্যাসিকগণকে আমরা জিজ্ঞাসা করিতে চাহি যে, তাঁহারা কি সেই ইংরাজ সভাপতির উক্তি সমর্থন করিতে প্রস্তুত আছেন? যদি থাকেন, তবে আমরাও তাঁহাদিগকে বলিব যে, এই সকল উপন্যাসের লেখক ও পাঠক উভয়েরই জন্য জাহ্নবীনদীর গর্ভে স্থানের নিশ্চয়ই অসংকুলান হইবে না। আর তাহা সমর্থন করিতে যদি প্রস্তুত না থাকেন, তবে তাঁহাদের নিকট কর-যোড়ে নিবেদন এই যে, তাঁহারা তাঁহাদের উপন্যাসে ঐ ইংরা-জের উক্তির প্রকারান্তরে সমর্থক অপ্রকৃত চিত্র প্রকাশে বিরত হউন—নিজেদের মা, বোন, মেয়ে ও স্ত্রীকে দেহে ও মনে-প্রাণে অসতীরূপে গড়িয়া তুলিতে নিরস্ত হউন।

একালের উপন্যাসে যে প্রকার ঘটনার সমাবেশ করা হয়, আমাদের দেশে সে প্রকার ঘটনা দু'একটাও সংঘটিত হওয়া যে একেবারেই অসম্ভব, তাহা বলি না। কিন্তু সাধারণতঃ এ প্রকার ঘটনা যে এদেশের প্রকৃতি-বিরুদ্ধ, সুতরাং এদেশের পক্ষে অস্বাভাবিক, তাহা বলা বাহুল্য। দেবর-ভ্রাতৃজায়ার মধ্যে যে রূপজ মোহ বা কামজ প্রেমের আবির্ভাব হইবেই না, এমন কথা বলা যায় না; কিম্বা ভাইবোনের মধ্যেও যে কামজ মোহ না আসিতে পারে, তাহাও বলা যায় না। এই জগতে এমন আরও এবং ইহা অপেক্ষাও গুরুতর কত অস্বাভাবিক বীভৎস ঘটনা তো ঘটিতেছেই। কিন্তু কথা হইতেছে এই যে, একালের উপন্যাসলেখকদিগের পক্ষে সেই ক্বচিৎ-সংঘটিত

বীভৎস অস্বাভাবিক ঘটনা ধরিয়া কামজ মোহকে প্রেমের উন্নত আসনে স্থান দিয়া পাঠকদের সম্মুখে উপস্থিত করা সঙ্গত কি না? আমরা শতবার বলিব, কিছুতেই সঙ্গত নহে। এই ভাবের উপর চলিলে তো মানুষকে পশুর সহিত সমস্তরে নামিয়া পড়িতে হয়। অবশ্য, তিব্বত প্রভৃতি যে দেশে স্ত্রীলোকের দেবর-বিবাহ প্রচলিত আছে, অথবা শ্যাম প্রভৃতি যে দেশে ভাইবোনের বিবাহ চলিত আছে বলিয়া শোনা যায়, সেই সকল দেশের উপন্যাসে ঐ প্রকার কামভাবকে উন্নত প্রেমের আসনে বসাইলে বিশেষ দোষের হইবে না, কারণ সেই সেই দেশে ঐ কামভাবের প্রকৃত প্রেমে পরিণতি ও চরিতার্থতা লাভের একটা সম্ভাবনা আছে। কিন্তু আমাদের দেশের প্রকৃতিতে সে সম্ভাবনা খুবই কম বলিয়া ঐ প্রকার চিত্রসকল অবোধ পাঠক-পাঠিকাদিগকে অবনতির দিকেই লইয়া যাইতে পারে।

আমাদের মতে এদেশের উপন্যাসলেখকগণ ঐ প্রকার কামজ মোহকেই মনোহর মূর্ত্তিতে অঙ্কিত করিয়া পাঠকদের সম্মুখে ধরিবার পরিবর্ত্তে, বৌঠাকুরাণীর হাটে উদয়াদিত্য-সুরমার যে প্রকার দাম্পত্য প্রেমের উন্নত বিশাল আদর্শ প্রদর্শিত হইয়াছে অথবা বিষবৃক্ষে শ্রীশচন্দ্র ও কমলমণির যে প্রকার পবিত্র গার্হস্থ্য চরিত্র প্রদর্শিত হইয়াছে, সেই প্রকার দাম্পত্য প্রেম বা গার্হস্থ্য চিত্র দেশবাসীর সম্মুখে স্থাপন করিলেই দেশের

মঙ্গল, জাতির মঙ্গল, জগতের মঙ্গল। তাঁহারা একটুখানি ধীরভাবে ভাবিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন যে, মহাসমরের পূর্ব্বে পাশ্চাত্য ভূখণ্ডে যে সমস্ত কথা হাটে-বাজারে প্রচলিত ছিল, সেই সমস্ত কথা তোতাপাখীর মত শিখিয়া পড়িয়া কথায় কথায় সংযমের আধার ও উৎস শাস্ত্রসকলকে নির্ব্বিচারে মিথ্যা, ধর্ম্ম একটা মস্ত ভড়ং প্রভৃতি উক্তি উপন্যাসের মধ্যে উদ্গার করিলে এবং কামভাবের অশ্লীল ও অস্বাভাবিক চিত্র-সমূহকে চক্ষের সম্মুখে বড় করিয়া ধরিলে কোন লাভ তো নাই-ই,—লাভের মধ্যে দেশের সর্ব্বনাশ। পূর্ব্বেই বলিয়া আসিয়াছি যে, এই সকল চরিত্র ও চিত্র পড়িতে পড়িতে, দেখিতে দেখিতে পাঠক-পাঠিকাদের মনে এইগুলি ক্রমশই স্বাভাবিক বলিয়া প্রতিভাত হইতে থাকে, আর তখন ঐ সকল অমঙ্গল-প্রসূ ভাবসমূহের উপরেই দেশের ছেলেমেয়েদের চরিত্র গঠিত হইতে থাকে।

এই প্রকার অপ্রকৃত অশ্লীল চিত্রপ্রকাশে একালের উপ-ন্যাসলেখকদিগের স্কন্ধেই বা সমস্ত দোষ দিই কি প্রকারে? বর্ত্তমান শিক্ষার দোষেই যে তাঁহারা শয়নে-স্বপনে আহারে-বিহারে বিলাতী ভাবভঙ্গীকেই সর্ব্বক্ষণ ধ্যানের বিষয় করিতে বাধ্য হন। তাই অন্ধ সংস্কারবশতঃ তাঁহারা নিজেদের গ্রন্থে পনেরো আনা পৌনে বারো পাই বিলাতী ভাব বিলাতী ঢং ঢুকাইয়া মনে করেন যে, সে সমস্তই খাঁটি দেশী ভাব। আবার

সেই সংস্কারেরই বশবর্ত্তী হইয়া তাঁহারা এদেশের প্রকৃতিবিরুদ্ধ বিলাতী চিত্রগুলিকে ভাষার অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যে সজ্জিত করিয়া জনসাধারণ্যে বহুল প্রচার করিয়া ক্রমশঃ সেগুলিকে এদেশের প্রকৃতিতে বদ্ধমূল করাইবার চেষ্টায় আছেন। বদ্ধমূল হইয়া গেলে লেখকেরা তো নয়ই, পাঠকেরাও এবং সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য দেশবাসীরাও সেই সমস্ত ভাবগুলিকে বিলাতী বলিয়া বুঝিতেই পারিবেন না, এবং তাহারই উপর তখন নিজেদের আচার-ব্যবহার গঠিত করিতে চেষ্টা করিয়া দেশের মঙ্গলের মূলে কুঠারাঘাত করিবেন।

আমরা যতই এ বিষয়ে আলোচনা করি, ততই দুঃখে অভি-ভূত হইয়া পড়ি যে, বঙ্কিমবাবুর ন্যায় সূক্ষ্মদর্শী লেখক ও বন্দেমাতরং গানের রচয়িতাও তাঁহার সুনীল আকাশের ন্যায় সুনির্ম্মল দেবীচৌধুরাণীর অনুরূপ আরও অনেক উপন্যাস লিখিবার পরিবর্ত্তে পঙ্কিল ডোবা হইতে বিষবৃক্ষ সংগ্রহ করিবার জন্য পঙ্কে ঝাঁপ দিলেন! হায়-হায়! যে রবীন্দ্রনাথের দেশ-হিতৈষণা মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া শান্তিনিকেতনের ব্রহ্মচর্য্য আশ্রমে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, সেই রবীন্দ্রনাথও রাজর্ষির ন্যায় ধূপধুনার মঙ্গলগন্ধবাহী উপন্যাস না লিখিয়া "নষ্টনীড়" "চোখের বালি" প্রভৃতির ন্যায় উপন্যাস লিখিতে প্রবৃত্ত হইলেন! কি আশ্চর্য্য! শক্তিশালী নবোদিত সুলেখক সাধুসঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া "চরিত্রহীন" প্রভৃতির মধ্যেই মনস্তত্ত্ব আবিষ্কারে সমস্ত

আত্মশক্তি প্রয়োগ করিলেন; গৃহে শ্রী আনিবার পরিবর্ত্তে "গৃহদাহ" করিবার ব্যবস্থা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন!

আরও দুঃখ হয় এই যে, একালের অনেক ঔপন্যাসিক তাঁহাদের ঐ সকল অস্বাভাবিক অপ্রকৃত ও অশ্লীল চিত্রপূর্ণ গ্রন্থগুলি বিদেশীয় ভাষায় অনুবাদ করাইয়া বিদেশের নিকটে দেশকে অন্যায়রূপে হেয় ও উপহাসাস্পদ করিতে কুণ্ঠিত হন না। বিদেশীয়দের মনে ভারতীয় সমাজের একটা অপ্রকৃত কদর্য্য চিত্র মুদ্রিত করিয়া দিয়া তাঁহাদের কি লাভ হয় জানি না। আমি মন্দ হইতে পারি, তুমি মন্দ হইতে পার, কিন্তু দেশশুদ্ধ লোককে মন্দ ভাবিয়া লওয়া এবং নিজের মনের সেই চিত্র আঁকিয়া তাহাই দেশবাসীর প্রকৃত চিত্ররূপে সকলকে দেখাইয়া আনন্দ অনুভব করা; কেবল নিজে আনন্দ অনুভব করা নহে, অপর পাঁচজনকে সেই চিত্র দেখাইয়া প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে নিজের সেই বিকৃতি-পথের পথিক করিবার চেষ্টা পাওয়া যে কতদূর অন্যায় তাহা বলিয়া শেষ করিতে পারি না।

আমাদের আশঙ্কা হয় যে, যে কারণেই হউক, এইরূপে যথার্থ বা সত্য প্রকৃতির বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া বিকৃতিকে প্রতিষ্ঠিত করিতে গেলে কোন-না-কোন সময়ে প্রকৃতি নিজের অধিকার বজায় রাখিতে অগ্রসর হইবেই। সেই চেষ্টার প্রবল বেগে সমাজের মধ্যে যে প্রচণ্ড ভূমিকম্প উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা,

তাহা ভাবিয়া আমাদের চিত্ত বিকল হইয়া পড়ে। ভগবান এদেশকে সেই বিপদ হইতে রক্ষা করুন।

ইতি শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর কথিত "আর্ট ও সাহিত্য" কথায় আর্টের প্রাণ ও একালের উপন্যাস বিষয়ক পঞ্চদশ কথা সমাপ্ত।

ষোড়শ কথা—আর্টের বহিরঙ্গ ও বঙ্কিমচন্দ্র।

"আর্ট ও সৌন্দর্য্য" প্রবন্ধে আমরা দেখাইয়া আসিয়াছি যে, সৌন্দর্য্যই হইল আর্টের বহিরঙ্গ বা পরিচ্ছদ। আর্টের সহিত সৌন্দর্য্যের যে একটা অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ আছে, তাহাও দেখিয়া আসিয়াছি। সৌন্দর্য্য ব্যতীত আর্ট ব্যক্ত আকার ধারণ করিতে পারে বলিয়া মনে হয় না। কোন একটী ভাল বিষয় আমার মনে আসিল; তাহার স্বাভাবিকতাও আমি উপলব্ধি করিলাম; কিন্তু তাহাকে যদি সৌন্দর্য্যের পরিচ্ছদ দিয়া ব্যক্ত করিতে না পারি, তবে তাহা আর্ট বলিয়া পরিগণিত হইবে না। আবার যদি কোন কুৎসিৎ বস্তুকে বহুমূল্য পরিচ্ছদে সজ্জিত করি, তবে সেই পরিচ্ছদকে আমরা প্রশংসা করিতে পারি বটে, কিন্তু সেই বস্তুকে আর্টসমন্বিত বলিতে পারি না। সেইরূপ কোন্ গ্রন্থে প্রকৃত আর্টের স্বরূপ কতটুকু বজায় আছে দেখিতে চাহিলে উহাতে আর্টের তিনটী অঙ্গের—সত্য, মঙ্গলভাব ও সৌন্দর্য্যের যথাযোগ্য সমাবেশ কতটুকু আছে তাহা দেখিতে হইবে। যে গ্রন্থে আর্টের যে যে অঙ্গের অভাব হইবে, সেই গ্রন্থে আর্ট সেই পরিমাণে অসম্পূর্ণ বা ক্ষুণ্ণ থাকিবে। তন্মধ্যে কোন গ্রন্থের চিত্রগুলি বহিঃসৌন্দর্য্যে সমধিক মণ্ডিত হইলেই, তাহাতে অন্য দুইটী অঙ্গের এক-আধটু কমবেশী থাকিলেও তৎসম্বন্ধীয় আর্টের অসম্পূর্ণতা সহজে আমাদের চক্ষে প্রতিভাত হয় না; কিন্তু ঐ

বহিঃপরিচ্ছদ সৌন্দর্য্যের অভাবে আর্ট ব্যক্ত আকার ধারণ করিতেই পারে না বলিয়া তাহার ন্যূনাধিক অভাব আমাদের চক্ষে সহজেই ধরা পড়িয়া যায়।

এই বহিঃসৌন্দর্য্য অনেক সময়ে আমাদের সম্মুখে এতই বড় আকারে আসিয়া উপস্থিত হয় যে, আমরা তাহাকেই সমস্ত আর্ট বলিয়া মস্ত ভুল করি। কোন উপন্যাসকে আর্টের বস্তু করিতে গেলে তাহাতে বহিঃসৌন্দর্য্যের সঙ্গে সঙ্গে অন্তঃসৌন্দর্য্যও ফুটাইয়া তুলিতে হইবে। অন্তঃসৌন্দর্য্য ভাব ও বিষয়ের উপর নির্ভর করে। বর্ত্তমানে উপন্যাসে—সেকালের এবং একালের—এই অন্তঃসৌন্দর্য্য কিপ্রকার পাওয়া যায়, তাহা একটু বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিয়া আসিয়াছি। এইবারে বর্ত্তমান উপন্যাসে বহিঃসৌন্দর্য্য কিরূপ পাওয়া যায়, তাহারই অল্পস্বল্প আলোচনা করিব। ভগবানকে কেন্দ্র করিলে, মঙ্গলভাবকে লক্ষ্য রাখিলে যেমন উপন্যাসের অন্তঃসৌন্দর্য্য পরিস্ফুট হইবার অবসর আসে, প্রকৃতিকে ভিত্তি করিলে এবং স্বাভাবিকতার উপর উপন্যাসকে দাঁড় করাইলে তেমনি তাহার বহিঃসৌন্দর্য্য পরিস্ফুট হইবার অবসর আসে। তবে উপন্যাসের, সাহিত্যের সকল বিভাগেরই, বহিঃপরিচ্ছদের সৌন্দর্য্য পরিণামে নির্ভর করে ভাষার পারিপাট্য এবং রচনা-চাতুর্য্যের উপর। উপন্যাসের বিষয় ও ভাব যতই প্রকৃতিকে অনুসরণ করিবে, স্বাভাবিক হইবে; তাহা যতই আমাদের

প্রাণমনকে উন্নত হইতে উন্নততর রাজ্যে লইয়া যাইবে, ততই সৌন্দর্য্য ভিতর হইতে ফুটিয়া বাহির হইবে। আবার সেই ভাব যতই সুন্দর ভাষায় ব্যক্ত হইবে, ভাষার চাতুর্য্যে ও লিপিকৌশলে যতই তাহা সুস্পষ্টরূপে আমাদের অন্তরে মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিবে, ততই আমরা তাহার সৌরভে মুগ্ধ হইয়া যাইব।

আমরা দেখিয়া আসিয়াছি যে, বিষয় ও ভাব সম্বন্ধে সেকালের উপন্যাস একালের উপন্যাস অপেক্ষা অন্তঃসৌন্দর্য্যে অনেক বেশী ধনী। আমরা ইহাও দেখিয়া আসিয়াছি যে, সেকালের উপন্যাসে সত্য প্রকৃতিকে বেশী ভিত্তি করা হইত বলিয়া আর্টের প্রাণ সমধিক রক্ষিত হইত এবং কাজেই বহিঃসৌন্দর্য্য প্রকাশেরও বেশী অবসর ছিল। প্রকৃতিকে অনুসরণ করিবার সঙ্গে বহিঃসৌন্দর্য্যের বড়ই ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। আমরা যে কোন সৌন্দর্য্য উপলব্ধি করি বা উদ্ভাবন করি, তাহার কোনটীতেই আমরা প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যকে অতিক্রম করিতে পারি না—প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের অনুসরণেই আমরা সুন্দরকে সুন্দর বলিয়া উপলব্ধি করি। পাঁচটা সৌন্দর্য্য মিলাইয়া নূতন যে সৌন্দর্য্য উদ্ভাবন করিলাম বলিয়া মনে করি, আমাদের অন্তরে প্রকৃতির সৌন্দর্য্য পর্য্যালোচনা করিয়া প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের যে একটী ধারণা হয়, ঐ নূতন সৌন্দর্য্য তাহার অ-বিরুদ্ধ, বরঞ্চ তাহার অনুসারী বলিয়াই আমরা তাহাকে

সুন্দর বলিয়া সিদ্ধান্ত করি। ইহা হইতে বুঝা যাইতেছে যে, উপন্যাসে সৌন্দর্য্য বজায় রাখিতে চাহিলে তাহার বিষয়ে, ভাবে এবং সেইগুলির বর্ণনায় প্রকৃতির বিরুদ্ধে চলিলে চলিবে না, প্রকৃতির অনুসরণ করিতে হইবে।

সত্য প্রকৃতিকে উপন্যাসের ভিত্তি করিবার ফলে বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি সেকালের প্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিকগণ তাঁহাদের গ্রন্থে সৌন্দর্য্য প্রকাশের যে অবসর পাইয়াছিলেন, সে অবসর তাঁহারা হেলায় নষ্ট হইতে দেন নাই। তাঁহাদের প্রদত্ত বহিঃ-সজ্জার সৌন্দর্য্য উপন্যাসের অন্তঃসৌন্দর্য্যের সহিত মিলিত হওয়ার এক আশ্চর্য্য নবতর সৌন্দর্য্য প্রস্ফুটিত কমলের আকারে আমাদের সম্মুখে প্রকাশ পায়। অন্তঃসৌন্দর্য্য সমধিক পরিমাণে বিদ্যমান থাকাতেই একালের অপেক্ষা সেকালের উপন্যাসে আর্টের বহিরঙ্গ বাহ্যিক সৌন্দর্য্যও অধিকতর উজ্জ্বল মূর্ত্তিতে প্রতিভাত হয়। আমরা ইতিপূর্ব্বে বিস্তৃতরূপেই বুঝাইয়া আসিয়াছি যে, যে স্বাভাবিকতা আর্টের প্রাণ, সেই স্বাভাবিকতার উপর সৌন্দর্য্য অনেক পরিমাণে নির্ভর করে। সে কথা পুনরায় বিস্তৃতরূপে বুঝাইতে যাওয়া আবশ্যক বলিয়া বিবেচনা করি না। তবে সোজাসুজি দু'একটা কথা বলিতে চাহি এই যে, সৌন্দর্য্য যখন আমাদের অন্তরের অনুভূতির বস্তু, তখন বলা বাহুল্য যে, যে বস্তু যত স্বাভাবিক হইবে, যতই আমাদের অন্তরে সহজে সাড়া দিবে, ততই তাহার সৌন্দর্য্যও

আমরা সহজে উপলব্ধি করিতে পারিব। আর, উপলব্ধি করিতে না পারিলে সৌন্দর্য্য যতই কেন উজ্জ্বল হউক না, তাহার কোন মূল্য নাই। সেকালের উপন্যাসের স্বাভাবিকতার কারণেই তাহাদের সৌন্দর্য্য সহজে আমাদের মর্ম্ম স্পর্শ করিয়া আমাদিগকে আত্মবিহ্বল করিয়া দেয়। এই কারণেই বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসগুলি সৌন্দর্য্যে ঢলঢল করিতেছে দেখি। এই আশ্চর্য্য সৌন্দর্য্য থাকাতেই বঙ্কিমবাবুর উপন্যাসগুলি দুই তিন পুরুষ ধরিয়া বঙ্গের শিক্ষিত সমাজকে মন্ত্রমুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। কেবল তাহাই নহে, সৌন্দর্য্যের মাত্রা বেশী থাকিবার কারণে গ্রন্থগুলির অসঙ্গতি বা অস্বাভাবিকতাগুলি একটু তলাইয়া না দেখিলে আমাদের নজরে পড়ে না।

বঙ্কিমবাবুর মত সাহিত্যসম্রাটের লেখায় সৌন্দর্য্য দেখাইতে আমার মত লোকের অগ্রসর হওয়াই অমার্জ্জনীয় অপরাধ নয় কি? আর দেখাইবই বা কি? আমি তো নিজেই দেবীচৌধুরাণীর মত গ্রন্থের ছত্রে ছত্রে সৌন্দর্য্যমদিরা পান করিয়া বিহ্বল হইয়া গিয়াছি। প্রকৃতই তাঁহার গ্রন্থগুলির ভাবে, ভাষায়, চিত্রে, সর্ব্ববিষয়ে সৌন্দর্য্য যেন দুকূল ছাপাইয়া উছলিয়া উঠিতেছে। কোথাও বা ঘন গাছের পাতার আড়াল হইতে শারদ পূর্ণচন্দ্রের কিরণ যেমন উঁকিঝুঁকি মারিয়া খেলা করে, আবার কোথাও বা যেমন সূর্য্যকিরণ স্বীয় পূর্ণসৌন্দর্য্যের উজ্জ্বল মহিমায় আত্মপ্রকাশ করে, এই গ্রন্থগুলিতেও সেইরূপ কোথাও

বা স্নিগ্ধ মধুর সৌন্দর্য্য অর্দ্ধ-অস্ফুটরূপে দেখা দিয়া নিজের সৌন্দর্য্য আরও বাড়াইয়া তুলিয়া আমাদের প্রাণমন হরণ করে; আবার কোথাও বা সুদৃপ্ত সৌন্দর্য্য নিজের ভাস্বরতায় আমাদের দৃষ্টিকে অন্ধ করিয়া তুলে। আমরা কোন্‌টীকে ছাড়িয়া কোন্ চিত্রটীর উল্লেখ করিব, ভাবিয়া পাই না। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রত্যেক গ্রন্থেরই প্রথম অবধি শেষ পর্য্যন্ত একটা একটানা সৌন্দর্য্যের ভিতর দিয়া চলিয়া আত্মহারা হইতে হয়।

দেবীচৌধুরাণীর কথা উল্লেখ করিলাম। এই দেবীচৌধুরাণীতে যে আর্টের তিনটী অঙ্গেরই সুন্দর সমাবেশ হইয়াছে, তাহা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়া আসিয়াছি। জানি না, ইহার ভাষান্তরে অনুবাদ করা হইয়াছে কিনা। যদি না হইয়া থাকে, তবে অবিলম্বে ইহার বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদ প্রকাশ করিয়া দেশবিদেশকে বাঙ্গালীর উন্নত আদর্শ, ভারতবাসীর অন্তর্নিহিত প্রকৃতি দেখানো হউক—জগত মুগ্ধ হউক, শিক্ষালাভ করুক। আর, এ কথায় আমাকে প্রহার খাইতে হইবে কিনা জানি না, কিন্তু মনের কথা না বলিয়াও থাকিতে পারিতেছি না। আমাদের মতে ঐ নবীন পাঠকের প্রতি টিটকিরির অংশ বাদ দিয়া, এই গ্রন্থের বহুল প্রচার করিলে দেশের মঙ্গলই হইবে। এইরূপ বাদ দিবার নজীরস্বরূপে আমরা প্রাতঃস্মরণীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর কর্ত্তৃক অশ্লীল অংশ বাদ দিয়া রঘুবংশ প্রভৃতি মুদ্রিত করিবার কথা উল্লেখ করিতে পারি।

দেবীচৌধুরাণীতে সাগর বৌয়ের ঘরে প্রফুল্লর সঙ্গে তাহার স্বামী ব্রজেশ্বরের সাক্ষাতের চিত্র কেমন স্বাভাবিক—স্বাভাবিক বলিয়াই এত মিষ্ট ও সুন্দর হইয়াছে। এ প্রকার সুন্দর ও মধুর চিত্র খুব অল্পই দেখিয়াছি। প্রফুল্লর মা, সাগর বৌ, ব্রহ্মঠাকুরাণী প্রভৃতিরও চিত্র যেমন স্বাভাবিকতায় ভরা, তেমনি সৌন্দর্য্যে ঢল-ঢল। বোধ হয় প্রত্যেক হিন্দু পরিবারে আজও এক-একটী ব্রহ্মঠাকুরাণী পবিত্রতা ও সরলতার মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া ধর্ম্ম ও শান্তি বিতরণ করিয়া থাকেন। ঐ যে প্রফুল্লকে ভবানী পাঠকের মাতৃসম্বোধনে আশ্বাসপ্রদান—উহা ভারতবাসীর পক্ষেই স্বাভাবিক বলিয়া ভারতবাসীই উহার সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হয়; পাশ্চাত্য ভূখণ্ডে এ ভাব স্বাভাবিক নহে বলিয়া আমরা নিশ্চয় বলিতে পারি যে, তথাকার অধিবাসীরা ইহার সৌন্দর্য্য উপলব্ধি করিতে পারিবে না। বিদ্যালয়ে পঠদ্দশায় একটী গল্প শুনিয়াছিলাম যে, এক গরীব কেরাণী তাঁহার প্রভু কোন ইংরাজের পত্নীর দয়ায় অভিভূত হইয়া তাঁহাকে মাতৃসম্বোধন করিবার ফলে, সেই প্রভু ইংরাজের হস্তে সেই কেরাণীকে বিশেষরূপে লাঞ্ছিত হইতে হইয়াছিল।

বিষবৃক্ষেও ঠিক এই প্রকার দুইটী অতি মিষ্ট অতি সুন্দর চিত্র দেখি—যাহা পড়িয়া-পড়িয়া-পড়িয়া পড়িবার ইচ্ছা কিছুতেই শেষ হইতে চাহে না। এই দুইটী চিত্রও ভারতবাসীরই পক্ষে স্বাভাবিক—পাশ্চাত্যের পক্ষে অ-স্বাভাবিক। কুন্দ পলাইবার

পর যখন পুনরায় নগেন্দ্রের বাগানে ঢুকিয়া সূর্য্যমুখীর কাছে ধরা পড়িল, তখন সূর্য্যমুখী কি কোমলকরুণ মিষ্ট স্বরে বলিল—“কে, কুন্দ নাকি ?” কুন্দ তখনও উত্তর দিতে পারে নাই। সূর্য্যমুখী স্বামীর সুখের জন্য এতদিন ধরিয়া যাহার সন্ধান করিতেছিল, আজ তাহার সন্ধান পাইয়া, দুঃখের মধ্যে সুখ পাইয়া সহজেই কুন্দের হাত ধরিল—সে হাত ধরাতে এতটুকু রাগ নাই, দ্বেষ নাই—কেবল একটা দুঃখের উদ্বেলিত-আবেগ আছে। তারপর, সূর্য্যমুখী দুঃখে উদ্বেলিত হৃদয়ে অথচ রুদ্ধ আবেগে বলিল “কুন্দ! এসো—দিদি বসো; আর আমি তোমায় কিছু বলিব না”। ভাবী সপত্নীকে এই দিদি বলিয়া আহ্বানের মধ্যে প্রাণের মর্ম্মভেদী অথচ রুদ্ধ আবেগ দুঃখের পূর্ণ সৌন্দর্য্যে বিকশিত হইয়া উঠিতেছে। এই সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া বিহ্বলচিত্তে সূর্য্যমুখীর সঙ্গে আমরাও কুন্দের হাত ধরিয়া রুদ্ধ বেদনে বলিয়া উঠি—“কুন্দ! এসো—দিদি এসো; আর আমি তোমায় কিছু বলিব না”। এমন মিষ্ট ও সুন্দর চিত্র ভারত ব্যতীত কুত্রাপি সম্ভবপর নহে।

আবার যখন সূর্য্যমুখী কুন্দের জন্য নগেন্দ্রের ছটফটানি দেখিয়া “তোমার সুখেই আমার সুখ” বলিয়া কুন্দকে বিবাহ করিবার জন্য নগেন্দ্রকে অনুমতি প্রদান করিল—সে চিত্রের তুলনা কোথায় ? এই প্রকার স্বার্থত্যাগের উন্নত-সুন্দর চিত্র একমাত্র এদেশেই সম্ভব হয়। বিষবৃক্ষের মধ্যে মধ্যে এইপ্রকার

কতকগুলি সুন্দর চিত্র আছে বলিয়াই, সেই সৌন্দর্য্য দেখিবার জন্যই "বিষবৃক্ষ" বিষবৃক্ষ হইলেও আজ বঙ্গের গৃহে গৃহে এত সযত্নে রোপিত হইতে চলিয়াছে।

স্বদেশপ্রেম বঙ্কিমবাবুর মজ্জাগত। তাঁহার সময়ে স্বদেশ-প্রেম ভারতের উর্ব্বর ভূমি ভেদ করিয়া সুপ্তোত্থিত সিংহের মত মস্তক উত্তোলন করিতেছিল। বঙ্কিমবাবু তাঁহার গ্রন্থে সেই স্বদেশ-প্রেমকে উজ্জ্বল মূর্ত্তি প্রদান করিয়া স্বাভাবিকতা ও সৌন্দর্য্যের মধ্যে এক অপূর্ব্ব সম্মিলন সাধন করিয়াছেন। বঙ্কিমবাবুর এমন গ্রন্থ নাই, যাহার ভিতর দিয়া কোন-না-কোন সূত্রে স্বদেশপ্রেম ফুটিয়া বাহির হয় নাই। এমন কি, বিষবৃক্ষে নগেন্দ্র যখন সূর্য্যমুখীর শয়নগৃহে প্রবেশ করিল, তখন গ্রন্থকার সেই গৃহের চিত্রগুলির যে বর্ণনা দিয়াছেন, সেই বর্ণনার মধ্যে একটীও বিদেশী চিত্রের উল্লেখ নাই। যাঁহারা এদেশের স্ত্রীলোকের রুচি ও মতিগতি জানেন, তাঁহারাই এই বর্ণনার মধ্যে স্বদেশপ্রেম, স্বাভাবিকতা ও সৌন্দর্য্যের এক অপূর্ব্ব সম্মিলন দেখিতে পাইবেন।

নৈসর্গিক দৃশ্যের সুন্দর চিত্র আঁকিতেও বঙ্কিমচন্দ্র সিদ্ধ-হস্ত। এ প্রকার সুন্দর ও স্বাভাবিক চিত্র আমরা অল্পই দেখিয়াছি। বিষবৃক্ষের প্রথমেই যে পথের চিত্র আঁকিয়া-ছেন, নগেন্দ্রের বৃহৎ অট্টালিকার যে চিত্র আমরা পাইয়াছি, অথবা আনন্দমঠের প্রথমেই যে দুর্ভিক্ষের হাহাকার দেখিয়াছি,

সে সমস্তই যেন গ্রন্থকার প্রত্যক্ষ করিয়া লিখিয়াছেন মনে হয়।

ইতি শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর-কথিত "আর্ট ও সাহিত্য"
কথায় আর্টের বহিরঙ্গ ও বঙ্কিমচন্দ্র
বিষয়ক ষোড়শ কথা সমাপ্ত।

সপ্তদশ কথা—আর্ট-সৌন্দর্য্যের অভাব—বঙ্কিমচন্দ্রে।

আমরা গ্রন্থারম্ভেই "আর্ট ও সত্য" প্রবন্ধে দেখিয়াছি যে, স্বাভাবিকতাই আর্টের প্রাণ এবং অস্বাভাবিকতাতেই আর্টের মৃত্যু। স্বাভাবিকতার অভাবে সৌন্দর্য্যেরও অভাব হয়। আমরা ইহাও দেখিয়া আসিয়াছি যে, দেবীচৌধুরাণীতে অস্বাভাবিকতার পরিমাণ এত অল্প যে, তাহা আমরা ধর্ত্তব্যের মধ্যে আনিতে চাহি না; কিন্তু আনন্দমঠে বা চন্দ্রশেখরে বা বিষবৃক্ষে, বিশেষতঃ শেষোক্ত গ্রন্থে স্বাভাবিকতার সঙ্গে অস্বাভাবিকতার যথেষ্টই সংমিশ্রণ আছে। এইপ্রকার সংমিশ্রণের অনুপাতে শেষোক্ত গ্রন্থগুলিতে সৌন্দর্য্যেরও অভাব ঘটিয়াছে। আনন্দমঠে ঐ যে কল্যাণী হাতিয়ার লইয়া বাহির হইল—তাহা জীর্ণশীর্ণ বঙ্গরমণীর পক্ষে অস্বাভাবিক হয় নাই কি? এবং অস্বাভাবিক বলিয়া এই চিত্রে সৌন্দর্য্যেরও বিশেষ অভাব হয় নাই কি? একটী একবস্ত্র, জীর্ণশীর্ণ, দুর্ভিক্ষক্লিষ্ট বঙ্গরমণী স্কন্ধে হাতিয়ার লইয়া চলিতেছে—এই কল্পনায় সৌন্দর্য্য কোথায়? সেইপ্রকার শান্তি যে অবস্থায় সন্ন্যাসীবেশে গৃহ হইতে বহির্গত হইল, সে অবস্থায় তাহার মুখে "দড়বড়ি ঘোড়া চড়ি কোথা তুমি যাও রে" গানটী যে কি পর্য্যন্ত অস্বাভাবিক হইয়াছে, তাহা একটুখানি ভাবিয়া দেখিলেই বুঝা যাইবে। একে তো এই গান, তাহাতে আবার ইহার সুর দেওয়া হইয়াছে বাগেশ্রী এবং তাল দেওয়া হইয়াছে

আড়া—মনে হয় যেন, গ্রন্থকার ইচ্ছাপূর্ব্বক এই চিত্রটাকে অতিমাত্র অস্বাভাবিক করিয়া তুলিয়াছেন। এই চিত্রটা অনেকটা Don Quixoteএর মূর্ত্তির ন্যায় দাঁড়াইয়া গিয়াছে!

চন্দ্রশেখরের প্রারম্ভে প্রতাপ-শৈবলিনীর নদীবক্ষে সন্তরণ ব্যাপারের অস্বাভাবিকতার কথা আমরা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়া আসিয়াছি। গ্রন্থকার এই চিত্রটাকে সুন্দর করিয়া তুলিবার যথেষ্ট চেষ্টা করিলেও ইহার অ-সৌন্দর্য্য দূর করিতে পারিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। চিত্রের শেষ অংশ এই—"অনেক দূর গিয়া প্রতাপ বলিল—'শৈবলিনী, এই আমাদের বিয়ে'!; শৈবলিনী বলিল 'আর কেন—এইখানেই'!; প্রতাপ ডুবিল। শৈবলিনী ডুবিল না।" যখনই দুইটী অপ্রাপ্তবয়স্ক বালক-বালিকার নবপ্রেমে হাবুডুবু খাইতে খাইতে নদীবক্ষে হাবুডুবু খাইবার চিত্র কল্পনা করি, তখন উহার সৌন্দর্য্য উপলব্ধি করা দূরে থাক, সত্য কথা বলিতে কি, মনের কোণে একটু যেন ঘৃণা আসিয়া উপস্থিত হয়। এই চিত্রটীর অস্বাভাবিকতা স্পষ্ট-রূপে দেখাইয়া আসিয়াছি, এখন ইহাতে সৌন্দর্য্যেরও অভাব দেখিলাম। কিন্তু গ্রন্থকারের ইহাতে যথেষ্ট সৌন্দর্য্য দিবার প্রবল চেষ্টাই ইহার অস্বাভাবিকতার বিষয়ে সাধারণ পাঠকপাঠিকার চক্ষে ধূলি নিক্ষেপ করে দেখিতে পাই। এই চিত্রের কোথায় যেন বেশ একটু বিলাতী গন্ধ পাই এবং মনে হয় যেন, সেই

বিলাতী গন্ধ থাকাতেই অস্বাভাবিকতা আসিয়াছে, এবং সেই অস্বাভাবিকতাই চিত্রের অ-সৌন্দর্য্যের প্রধান কারণ।

বিষবৃক্ষে যেমন অস্বাভাবিকতার পরিমাণ অপেক্ষাকৃত বেশী দেখা যায়, সেইরূপ ভাষার সৌন্দর্য্যে ও রচনাচাতুর্য্যে গ্রন্থকারের সেই অস্বাভাবিকতা ঢাকিবার চেষ্টাও তাঁহার অন্যান্য গ্রন্থের তুলনায় অনেক বেশী দেখা যায়। আর্টের মূলমন্ত্রের বিরুদ্ধে চলাই বিষবৃক্ষে এইপ্রকার অস্বাভাবিকতা আসিবার একটী প্রধান কারণ। গ্রন্থকার পরিণামে মঙ্গল-ভাবকে কোনপ্রকারে গ্রন্থের উদ্দেশ্যরূপে দাঁড় করাইয়াছেন বটে, কিন্তু তিনি তাঁহার অন্যান্য গ্রন্থ যেপ্রকার মঙ্গলভাবকে চক্ষের সমক্ষে ধরিয়া লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, বিষবৃক্ষ লিখিবার সময় তাহা করিয়াছিলেন কি না সন্দেহ করি। আমাদের খুব সন্দেহ হয় যে, এই গ্রন্থ কোন সত্য ঘটনা অবলম্বনে লিখিত, এবং সেই কারণে মঙ্গলভাবকে গ্রন্থের লক্ষ্য রাখিবার কথা তাঁহার মনে উঠিবার অবসরই ঘটে নাই। গ্রন্থকার যেমন গ্রন্থের অনেক স্থলে মঙ্গলভাবকে লক্ষ্য রাখিতে পারেন নাই, সেইরূপ অনেক স্থলে তিনি গ্রন্থটীকে প্রকৃতি-স্থও রাখিতে পারেন নাই—এদেশের প্রকৃতিবিরুদ্ধ বিলাতী ভাব, মনে হয় যেন, অনেক স্থলে বড় বেশী উঁকিঝুঁকি মারিতেছে। অনূর্দ্ধ তেরো বৎসরের বালিকা কুন্দকে দেখিবামাত্রই ৩০ বৎসরের যুবক নগেন্দ্রের প্রেমের সাগরে হাবুডুবু খাওয়া

—এটী love at first sightএর বঙ্গানুবাদ ব্যতীত আর কিছুই মনে হয় না। আবার এই সম্বন্ধেই নগেন্দ্রের তাঁহার বন্ধুকে সুদীর্ঘ পত্র লেখা এবং বন্ধুবরের সেই পত্রের উত্তরে প্রেমের উপর দার্শনিক তত্ত্ব ফলানো বা philosophise করা—সকলে স্বীকার করিবেন কি না জানি না, কিন্তু আমাদের বিশ্বাস যে, এটী ইংরাজী নবেলের অসম্পূর্ণ অনুকরণ মাত্র।

মঙ্গলভাবকে গ্রন্থের সম্পূর্ণ লক্ষ্য করা হয় নাই এবং প্রকৃতিকেও ইহার সম্পূর্ণ ভিত্তি করা হয় নাই বলিয়া, সূক্ষ্মদর্শী গ্রন্থকার অন্তরে অন্তরে ইহার সৌন্দর্য্যের অভাবের সম্ভাবনা বুঝিয়াছিলেন; এবং সেই কারণে বিষবৃক্ষকে অন্যান্য উপন্যাস অপেক্ষা সুন্দর করিয়া গড়িয়া তুলিবার জন্য গ্রন্থকারের বিধিমত, একটু বিশেষ চেষ্টাচরিত্র করিতে হইয়াছে মনে হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয়, বিশেষ চেষ্টা করিয়াও, অথবা বেশী চেষ্টা করিবার ফলেই, গ্রন্থকার এই গ্রন্থের অনেক স্থলে স্বাভাবিক ভাব রক্ষা করিতে পারেন নাই, এবং সেইজন্য সৌন্দর্য্যেরও বিশেষ হানি হইয়াছে দেখি। গ্রন্থকার নগেন্দ্রের দ্বারা বন্ধু হরদেবকে কুন্দ সম্বন্ধে যে চিঠি লিখাইয়াছেন, তাহাতে মঙ্গলভাব, স্বাভাবিকতা এবং সৌন্দর্য্যের এতই অভাব যে, তাহা পড়িয়া নগেন্দ্রের প্রতি আমাদের সহানুভূতি তো আসেই না, বরঞ্চ তৎপরিবর্ত্তে নগেন্দ্রের কেমন একটী কামুক ফুটফুটে বাবুগোছের চেহারা আমাদের মনশ্চক্ষে প্রতিভাত হয়, এবং গ্রন্থকারের শত

রচনাকৌশল ভেদ করিয়াও আমাদের প্রাণের ভিতর হইতে কেমন যেন একটা ঘৃণা জাগিয়া উঠে। এই চিত্রের দ্বারা যেমন গ্রন্থকার গ্রন্থের সৌন্দর্য্য নষ্ট করিয়াছেন, সেইরূপ দেবেন্দ্রের সেই বৈষ্ণবীর সাজে নগেন্দ্রের অন্তঃপুরে যাইবার বীভৎস চিত্রের অবতারণা করিয়াও গ্রন্থের সৌন্দর্য্য অনেকটা মাটি করিয়াছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের ন্যায় আর্টের পারদর্শী কেন যে গ্রন্থের সৌন্দর্য্য এ ভাবে নষ্ট করিলেন, তাহা আমাদের ধারণাতেই আসে না।

স্বাভাবিকতার অভাবেও যেমন সৌন্দর্য্যের অভাব ঘটে, অপ্রাসঙ্গিক বিষয়ের সমাবেশেও সেইরূপ সৌন্দর্য্যের হানি হয়। স্বাভাবিকতা থাকিলেই তো প্রাসঙ্গিকতাও থাকিবে—প্রকৃতি-রাজ্যে স্বাভাবিক কোন বিষয় কার্য্যকারণপরম্পরা ব্যতীত অপ্রসঙ্গক্রমে সহসা আবির্ভূত হইতে পারে না। আবার, প্রসঙ্গক্রমে যে বিষয় উপস্থিত হইবে, তাহাও তো স্বাভাবিক-ভাবেই আসিবে—সুতরাং তাহার স্বাভাবিকতাও স্বতঃসিদ্ধ। কাজেই বলিতে হয় যে, অপ্রাসঙ্গিক বিষয় উপস্থিত করিলেই তাহার সঙ্গে অস্বাভাবিকতা এবং সুতরাং সৌন্দর্য্যের অভাবও আসিবার খুব বেশী সম্ভাবনা।

নগেন্দ্র কুন্দকে বিবাহ করিয়া নিজকৃত কার্য্যের কৈফিয়ৎ দিয়া বন্ধু হরদেবকে এক পত্র লেখে। হরদেব তাহার উত্তর দেয়। এখন, সেই উত্তরের ভিতর কালিদাস; বায়রণ, জয়দেব

রূপজ মোহের কবি, অথবা সেক্ষপীয়র, বাল্মীকি, ভাগবতকার যথার্থ প্রণয়ের কবি, এই ঘোর বিসম্বাদী বিষয় প্রবেশ করাই-বার কোনই প্রয়োজন ছিল না। স্পষ্টই বুঝা যায় যে, গ্রন্থকার নিজের মতামত জানাইবার জন্যই এ কথা জোর করিয়া ঢুকাইয়া দিয়াছেন। অবশ্য ইহা জানা কথা যে, গ্রন্থকারমাত্রই নিজের নিজের গ্রন্থে নিজ নিজ মতামত ঢুকাইয়া দেন; কিন্তু সেই ঢুকাইবার প্রণালী স্বতন্ত্র—এভাবে প্যাটপ্যাটে করিয়া নিজের মতামত প্রকাশ করা বোধ হয় আর্টের উপযুক্ত সৌন্দর্য্য-সাধনের বিরোধী। আর, ঐ উত্তরের মধ্যে হরদেব যে সমস্ত বড় বড় দার্শনিক কথার অবতারণা করিয়াছে, তাহাতে প্রাসঙ্গিকতার ছোঁয়াটুকুমাত্র আছে বলিয়া মনে হয়—এত বড় দীর্ঘ বক্তৃতা সম্পূর্ণ আবশ্যক ছিল মনে হয় না। নগেন্দ্র তাহার মনের যে অবস্থায় হরদেবকে চিঠি লিখিয়াছিল এবং যে অবস্থায় ঐ উত্তর পাইয়াছিল, সে অবস্থায় বন্ধুর আবিষ্কৃত দার্শনিক তত্ত্বগুলি ধীরভাবে পড়িবার ও আলোচনা করিবার উপযুক্ত ধৈর্য্য নগেন্দ্রের ছিল কি না জানি না; কিন্তু উহা পড়িতে আমাদের যে ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটে, তাহা অস্বীকার করিলে মিথ্যা কথা হইবে।

এইপ্রকার অপ্রাসঙ্গিকতা গ্রন্থের আরও এক স্থানে আছে। সূর্য্যমুখীর পিতার দাসীপুত্র তারাচরণকে সর্ব্বসমক্ষে উপস্থিত করিবার জন্য গ্রন্থকার কালিদাস-মালিনী সংবাদের অবতারণা করিয়াছেন; এবং তাহার উপমা দিয়া গ্রন্থের প্রারম্ভভাগের

কয়েকটী পরিচ্ছেদকে উপন্যাসের সিঁড়ি বলিয়া পাঠকদের নিকট কাতরোক্তি করিয়াছেন। এই সংবাদের অবতারণা অথবা কাতরোক্তি গ্রন্থকার কেন যে করিলেন, তাহার কারণ আমরা ঠিক করিয়া বুঝিয়া উঠিতেই পারিতেছি না। ইহা না থাকিলে উপন্যাসখানি অশুদ্ধ হওয়া দূরে থাক, বরঞ্চ উহাতে সৌন্দর্য্যের ন্যূনতা ঘটিত না। এই অংশকে গ্রন্থের মধ্যে একটা উড়িয়া-আসিয়া-জুড়িয়া-বসা-গোছের নিষ্প্রয়োজন অপ্রাসঙ্গিক অংশ বলিয়া স্পষ্ট বোঝা যায়।

বিষবৃক্ষে জলসেচনের জন্য গ্রন্থকার দেবেন্দ্রের ন্যায় একটী মাতালকে রঙ্গমঞ্চে উপস্থিত করা আবশ্যক মনে করিয়াছেন। আবশ্যক ছিল বলিয়া আমরা মনে করি না। ভাল; ইহার প্রয়োজনীয়তা না হয় স্বীকার করাই গেল। কিন্তু যেমন দেবেন্দ্রের বৈষ্ণবীসাজে নগেন্দ্রের অন্তঃপুরে যাওয়াটা একটা উড়ুট্টেগোছের অস্বাভাবিক ব্যাপাররূপে দাঁড়াইয়া গ্রন্থের সৌন্দর্য্যের যথেষ্ট হানি করিয়াছে, সেইরূপ দেবেন্দ্রের চরিত্র-প্রসঙ্গে জোর করিয়া ব্রাহ্মসমাজকে উপস্থিত করিয়া তাহাকে হেয় ও নিন্দার্হ প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টাও নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক এবং বঙ্কিমবাবুর ন্যায় উদারহৃদয় ব্যক্তির সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত হইয়াছে বলিয়া স্বীকার করিতেই হইবে। ঐ স্থানটী পড়িলেই মনে হয় যে, যে কারণেই হউক, গ্রন্থকার ব্রাহ্মসমাজের বিরুদ্ধে কোন একটী ভাব বহুকাল যাবৎ অন্তরে পোষণ করিতে-

ছিলেন; যেমন একটী অবসর পাইলেন—প্রাসঙ্গিক হউক বা অপ্রাসঙ্গিক হউক—আর তিলার্দ্ধ অপেক্ষা না করিয়া সেই বিরোধী ভাবটা ব্যক্ত করিয়া তবে নিশ্চিন্ত হইলেন। আমাদের মতে, এবং ইহা সর্ব্ববাদসম্মত যে, প্রসঙ্গক্রমে আসিলেও—অপ্রসঙ্গে তো কথাই নাই—ব্রাহ্মসমাজ কেন, কোন ধর্ম্ম-সমাজকেই অন্যায়রূপে উপহাসের বিষয় করিবার চেষ্টা পাওয়া কেবল অসঙ্গত নহে, উহা নিন্দার্হ। এই অপ্রাসঙ্গিক বিষয়ের অবতারণায় গ্রন্থের কতটা যে সৌন্দর্য্যহানি হইয়াছে তাহা বলা যায় না।

এই দেবেন্দ্র যখন নগেন্দ্রের অন্তঃপুর হইতে ফিরিয়া আসিয়া বৈষ্ণবীর বেশ ছাড়িয়া নিজের বৈঠকখানায় বসিয়া তামাকু সেবন করিতে লাগিল, সেই স্থলে, দেবেন্দ্রের মুখে নহে, গ্রন্থকার নিজমুখে হুকার উপর একটা সুদীর্ঘ প্রশংসাপত্র সন্নিবেশিত করিয়াছেন। এই প্রশংসাপত্রের এস্থলে সন্নিবেশের কোনই প্রয়োজন তো দেখি না। দেবেন্দ্রের চরিত্র বেশী ফুটাইয়া তুলিবার জন্য এই প্রশংসাপত্র সন্নিবেশের প্রয়োজন থাকিলেও দেবেন্দ্রের মুখ দিয়াই ইহা ব্যক্ত করাইলে কতকটা সঙ্গতি থাকিতে পারিত—বুঝিতাম যে, মাতাল দেবেন্দ্র মাতালের জড়ানো ভাষায় হুকার প্রশংসা করিতেছে। কিন্তু গ্রন্থকার তাহার পথ পূর্ব্ব হইতেই মারিয়া রাখিয়াছেন। একে তো একটা বিক্ষোভক দুঃসাহসিক কার্য্য (exciting adventure)

হইতে দেবেন্দ্র সেইমাত্র ফিরিয়া আসিল, কাজেই তখন মাতালের জড়ানো ভাষা তাহার মুখে আসা দূরে থাক্, হয়-তো ধরা পড়িবার ভয়ে বুক দুরদুর করিয়া কাঁপিতেছিল। আর তার পর, গ্রন্থকার নিজেই বলিয়া দিতেছেন যে, দেবেন্দ্র খানিকক্ষণ তামাকু সেবন করিয়া তৃপ্তিলাভের অভাবে সুরাপান আরম্ভ করিল। কাজেই ঐ ভাবে হুক্কার প্রশংসাও দেবেন্দ্রের মুখে ঠিক ঐ মুহূর্ত্তে শোভা পাইত না। যাই হোক, গ্রন্থকার নিজমুখে সহসা হুক্কার এরূপ প্রশংসাপত্র সন্নিবেশিত করাতে তাঁহার তামাকু-প্রীতি অভিব্যক্ত হইলেও উহার অপ্রাসঙ্গিকতা এবং তজ্জনিত অ-সৌন্দর্য্য আমাদিগকে বড়ই আঘাত করে।

ইতি শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর কথিত "আর্ট ও সাহিত্য"
কথায় আর্ট-সৌন্দর্য্যের অভাব—বঙ্কিমচন্দ্রে
বিষয়ক সপ্তদশ কথা সমাপ্ত।

ওঁ

অষ্টাদশ কথা—আর্টের বহিরঙ্গ ও রবীন্দ্রনাথ।

রবীন্দ্রনাথের বৌঠাকুরাণীর হাট এবং রাজর্ষি, এই দুই গ্রন্থের প্রথম অবধি শেষ পর্য্যন্ত সাধুভাব আছে, গাম্ভীর্য্য আছে, ঔদার্য্য আছে—এক কথায় গম্ভীর সৌন্দর্য্য আছে। বঙ্কিমচন্দ্রের বিষ-বৃক্ষ, চন্দ্রশেখর প্রভৃতি উপন্যাসে, এমন কি, আনন্দমঠ ও দেবী-চৌধুরাণীতেও একপ্রকার সাংসারিকতার, একপ্রকার কামজ পার্থিব প্রেমের চাঞ্চল্য ও মাদকতা আছে; বঙ্কিমচন্দ্রের কোন উপন্যাসই এই মাদকতার হাত এড়াইতে পারিয়াছে কিনা সন্দেহ। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস পড়িবার পর রবীন্দ্রনাথের এই দুইটী উপন্যাস পড়িলে যে কি এক অপূর্ব্ব শান্তি আসে, হৃদয় যে কি বিশ্রাম লাভ করে তাহা বলা যায় না। সূর্য্যতাপে দগ্ধপ্রায় হইলে একটুখানি বটের ছায়াতে মৃদুমন্দ মলয়হিল্লোলের স্পর্শে প্রাণ যেমন স্নিগ্ধ ও শীতল হয়, ক্ষণকালের জন্যও যেমন আমাদের সান্ত ভাব অনন্তের আনন্দে ডুবিয়া গিয়া আশ্রয় লাভ করে, বঙ্কিমচন্দ্রের বিষবৃক্ষের ন্যায় উপন্যাস হইতে রবীন্দ্রনাথের এই দুইটী উপন্যাস পড়িলেও ঠিক সেই ভাবের উপলব্ধি হয়—প্রাণে যেন প্রভাতের সুবিমল বায়ুর স্পর্শ অনুভূত হয়। বড় দুঃখ হয় যে রবীন্দ্রনাথ এই শ্রেণীর আরও অনেক উপন্যাস রচনায় হস্তক্ষেপ করেন নাই।

এই দুইটী গ্রন্থেই যে কয়টী প্রধান চরিত্র চিত্রিত হইয়াছে, সকল কয়টীই অত্যন্ত স্বাভাবিক এবং সেই কারণেই সুন্দর

হইয়াছে। আমরা "আর্টের প্রাণ—রবীন্দ্রনাথে" প্রবন্ধে এই দুই গ্রন্থের যে কয়টী চিত্রের স্বাভাবিকতা দেখাইয়াছি, তাহাদের প্রত্যেকটীরই সৌন্দর্য্যও শতধারে স্ফুরিত হইতেছে। রাজর্ষির গোবিন্দমাণিক্যের শান্ত সৌম্য মূর্ত্তি বাঙ্গালার উপন্যাসে কয়টী আছে? বৌঠাকুরাণীর হাটের ঐ রাজা বসন্তরায় দাদামহাশয়ের চিত্রে সৌন্দর্য্য কি প্রকার ফুটিয়া উঠিয়াছে! যুবরাজ ও তাঁহার পত্নীর দাম্পত্য প্রেমের স্নিগ্ধ পবিত্রতা কি গম্ভীর সৌন্দর্য্যে আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হয়!

আমরা দেখিয়া আসিয়াছি যে, যেমন বঙ্কিমচন্দ্রের দেবীচৌধুরাণীতে অস্বাভাবিকতা, সুতরাং অসৌন্দর্য্যেরও মাত্রা খুবই অল্প, সেইরূপ রবীন্দ্রনাথের রাজর্ষিতেও অস্বাভাবিকতার অভাবের কারণেই সৌন্দর্য্যের অভাবও এত অল্প দেখা যায় যে, তাহা আমরা আলোচনাক্ষেত্রে ধর্ত্তব্যের মধ্যেই আনিতে চাহি না। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের বৌঠাকুরাণীর হাটে স্বাভাবিকতার সঙ্গে কতক পরিমাণে অস্বাভাবিকতাও মাথানো আছে। এই সকল অস্বাভাবিক চিত্রের দ্বারা গ্রন্থের সৌন্দর্য্যেরও যে বিশেষ হানি হইয়াছে, তাহা বলা বাহুল্য। সেই চিত্রগুলির পুনরুল্লেখ করিয়া গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধি করিতে ইচ্ছা করি না। তন্মধ্যে মঙ্গলার পরোক্ষভাবে রাজমহিষী দ্বারা বিষপ্রদানে সুরমার হত্যাসাধন এবং রমাই ভাঁড়ের নিষ্প্রয়োজন কার্য্যাবলীর চিত্র গ্রন্থের সৌন্দর্য্য বড়ই বিধ্বস্ত করিয়াছে বলিয়া তাহার

এস্থলে পুনরুল্লেখ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। তদ্ব্যতীত, সুরমার মৃত্যুর পর প্রতাপাদিত্যের ভয়ে উদয়াদিত্যকে যে-প্রকার প্রতিপদে ভীতিবিহ্বলরূপে চিত্রিত করা হইয়াছে, তাহাতে উদয়াদিত্যের চরিত্রের পৌর্ব্বাপর্য্য বেশ সুসম্বদ্ধ দাঁড় করানো হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না, কাজেই এখানেও সৌন্দর্য্যের অভাব ঘটিয়াছে বলিতে হইবে। তার পর, মঙ্গলা বা রুক্মিণীর চাহিবামাত্রে তাহাকে উদয়াদিত্যের নিজের হাত হইতে আংটি খুলিয়া দেওয়া—যাহার জন্য বলিতে গেলে চরম বিভ্রাট ঘটিল—উদয়াদিত্যের চরিত্রের সহিত, তাঁহার ধীর-গম্ভীর বিচার-ভাবের সহিত ইহার কতদূর সঙ্গতি আসে বলিতে পারি না। যাই হোক, দুইচারিটী চরিত্রে এক-আধটু অসঙ্গতি বা সৌন্দর্য্যের অভাব থাকিলেও, মোটের উপর ইহা অস্বীকার করা যায় না যে, তাঁহার এই গ্রন্থেরও চরিত্র-চিত্রগুলি সৌন্দর্য্যে ঢলঢল।

রবীন্দ্রনাথ চরিত্র অঙ্কনে যেরূপ, প্রাকৃতিক দৃশ্যের বর্ণনাতেও সেইরূপ সিদ্ধহস্ত। তাঁহার দুইটী গ্রন্থেই মনস্তত্ত্ব, প্রকৃতির অন্তর্ভাব ফুটাইবার দিকে বেশী ঝোঁক দেখা গেলেও, প্রকৃতির বহির্বিকাশ, বহিঃপ্রকৃতিও বড় কম সুনিপুণভাবে অঙ্কিত হয় নাই। প্রতাপাদিত্য বসন্তরায়কে বধ করিবার জন্য দুইজন পাঠান পাঠাইয়াছেন। বসন্তরায়ের অনুচরেরা পাছে তাঁহার হত্যায় বাধা দেয়, সেই কারণে সেই পাঠানদের মধ্যে একজন

সেই অনুচরদিগকে একটা ছুতা করিয়া বসন্তরায় হইতে পৃথক্ করিয়া কোন্ এক অজানা স্থানে লইয়া গিয়া সহসা তাহাদিগকে ফেলিয়া অদৃশ্য হইল। সেই অনুচরেরা তখন বাধ্য হইয়া পথ খুঁজিয়া বসন্তরায়ের নিকটেই ফিরিয়া আসিয়া সেই পাঠানের জাঁহাবাজী বলিতে উদ্যত হইল। বলিবার আরম্ভেই, একটা আমবাগান বাঁ-হাতী বা ডান-হাতী, তাহা লইয়াই মহা বিতর্ক উঠিল। তখন সম্মুখের মহাবিপদের কথা তাহাদের মনেই আসিল না। সেই তর্কবিতর্ক এতই স্বাভাবিক ও সুন্দর হইয়াছে, মনে হয় যেন, আমরাও সেই স্থানে দাঁড়াইয়াই তাহাদের তর্কবিতর্ক শুনিতেছি। উদয়াদিত্য যখন অশ্বারোহণে পল্লীগ্রামের পথে ছুটিয়া চলিয়াছেন, অথবা তিনি যখন রায়গড়ে পলায়ন করিয়া বৃদ্ধ দাদামহাশয়ের আশ্রয় লাভ করিয়া তাঁহার সঙ্গে প্রকৃতির সঙ্গে আপনাকে মিশাইয়া বাস করিতেছেন, গাছের ছায়ায়, সূর্য্যের আলোকে, আকাশের মুক্ত বায়ুতে বিচরণ করিয়া সংসারের ভয়-ভাবনা হইতে মুক্তি লাভ করিয়া একটুখানি স্বাধীনতা উপভোগ করিতেছিলেন, সে চিত্র কি সুন্দর! কি মিষ্ট! রবীন্দ্রনাথের প্রাকৃতিক বর্ণনার একটু বিশেষত্ব এই যে, সেগুলিতে তাঁহার অনির্ব্বচনীয় কবিত্ব মাখানো আছে। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রাকৃতিক দৃশ্যের বর্ণনা বড়ই প্রত্যক্ষদ্যোতক, তাই সেই বর্ণনা পাঠকদিগকে সঙ্গে টানিয়া লইয়া যায়—পাঠকদিগকে একটুখানি ভাবিবার অবসর দেয় না।

রবীন্দ্রনাথের বর্ণনা পাঠকদিগের ধরিয়া লইতে হয়—উহাও খুবই প্রত্যক্ষদ্যোতক হইলেও উহারই মধ্যে কোথায় যেন একটু ছায়া-ছায়াভাব লুকাইয়া থাকে, পাঠকদিগকে বুঝিয়া-বুঝিয়া ধরিয়া-ধরিয়া ধীরে ধীরে বর্ণনার সঙ্গে চলিতে হয়।

উপন্যাসের ধরণেই বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের মধ্যে বেশ একটা পার্থক্য সুস্পষ্ট উপলব্ধ হয়। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে পরকীয়াপ্রবণ পার্থিব প্রেমের একটা গণ্ডগোল যেন থাকিবেই; কিন্তু রবীন্দ্রনাথের সেকালের উপন্যাসে তাহার খুবই অভাব দেখা যায়—নাই বলিলেই চলে। বৌঠাকুরাণীর হাটে মঙ্গলার সম্পর্কে এই ভাবের যেটুকু চিত্র দেওয়া হইয়াছে, তাহাতে গ্রন্থের সৌন্দর্য্যের বিশেষ হানি হইয়াছে বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস। বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রন্থে নায়কনায়িকাদের পলায়নের এবং (motion) চলের একটা হুড়াহুড়ি আছে, খোঁজ-খোঁজ ব্যাপারের একটা হুলস্থূল কাণ্ড যেন থাকিবেই; অনেক সময়ে বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রন্থ পড়িতে পড়িতে সেই বহুপুরাতন উপন্যাস "উদাসিনী রাজকন্যার গুপ্তকথার" ছায়া অজ্ঞাতভাবেই আমাদের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হয়। রবীন্দ্রনাথের ঐ দুই গ্রন্থে এপ্রকার হুড়াহুড়ির হুলস্থূলের ভাব ততটা দেখা যায় না—একটুখানি অপার্থিব ভাব দেখা যায়; তাঁহার এই দুই গ্রন্থের অধিকাংশ স্থলেই যেন শান্তির স্নিগ্ধ শীতল শারদ জ্যোৎস্নাধারা নীরবে অবিশ্রান্ত-ধারে বহিতেছে উপলব্ধি হয়।

এই পার্থিব ও অপার্থিব ভাব থাকাতেই উভয় গ্রন্থকারের উপন্যাসে মৃত্যুও দুই বিভিন্নভাবে বর্ণিত দৃষ্ট হয়। বিষবৃক্ষে আমরা কুন্দনন্দিনীর আত্মহত্যা এবং দেবেন্দ্রের মৃত্যু দেখিয়াছি; চন্দ্রশেখরে প্রতাপের মৃত্যু এবং দলনীবেগমের বিষপানে আত্মহত্যা দেখিয়াছি; আনন্দমঠে মহেন্দ্রের স্ত্রীর বিষপানে আত্মহত্যার চেষ্টা দেখিয়াছি। এই সকল মৃত্যুর দিকে আমাদের সহানুভূতি খুব কমই যায়। এই সকল মৃত্যুর বর্ণনা পড়িতে পড়িতে আমাদের হৃৎপিণ্ড ধড়ধড় করিতে থাকে বটে, প্রাণ যেন বাহির হইয়া ক্রমাগত "তার পর কি হইল" এইরূপ প্রশ্ন করিতে থাকে; কিন্তু উপরোক্ত মৃত্যুগুলির কোন চিত্রেরই প্রতি আমাদের প্রাণের যথার্থ সহানুভূতি পৌঁছায় কি না সন্দেহ—একটা করুণার ভাব জাগিয়া উঠে মাত্র। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের বৌঠাকুরাণীর হাটে যখন বসন্ত রায়ের হত্যা আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়, তখন আমাদের সমস্ত মনপ্রাণ তাঁহার জন্য সহানুভূতিতে ভরিয়া উঠে—মর্ম্ম ভেদ করিয়া ক্রন্দন ফুকারিয়া উঠিতে চায়। সেইপ্রকার রাজর্ষি গ্রন্থে জয়সিংহ যখন রাজা গোবিন্দমাণিক্যকে বধ করিবার পরিবর্ত্তে পুরোহিত রঘুপতির সম্মোহনী শক্তিবলে প্রতারিত হইয়া দেবীর নিকটে আত্মবলি দিল, তখন তাহার প্রতি সমস্ত হৃদয়ের সহানুভূতি কিপ্রকার ছুটিয়া যায়! তাহার সেই ছুরিকা বক্ষ বিদ্ধ করিবার পূর্ব্বেই যেন আমাদের সমস্ত প্রাণমন

সেই আঘাত আটকাইতে ছুটিয়া যায়—সমস্ত মনুষ্যত্ব উন্নতির অভিমুখে এক সোপান অগ্রসর হয়।

ইতি শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর কথিত "আর্ট ও সাহিত্য"
কথায় আর্টের বহিরঙ্গ ও রবীন্দ্রনাথ বিষয়ক
অষ্টাদশ কথা সমাপ্ত।

ঊনবিংশ কথা—আর্টের বহিরঙ্গ ও একালের উপন্যাস।

আমরা দেখিয়া আসিলাম যে, সেকালের উপন্যাসে যথার্থ প্রকৃতিকে ভিত্তি করা হইত বলিয়া আর্টের যাহা প্রাণ, সেই স্বাভাবিকতা যথেষ্ট পরিমাণে থাকিত, এবং সেই স্বাভাবিকতা থাকিবার কারণেই আর্ট সেকালের উপন্যাসে একালের অপেক্ষা অনেক বেশী স্ফুরিত হইত। একালের উপন্যাসে অধিকাংশ স্থলেই প্রকৃতির পরিবর্ত্তে বিকৃতিকেই ভিত্তি করা হয় বলিয়া স্বাভাবিকতা থাকিতে পারে না, এবং সেই কারণে প্রকৃত সৌন্দর্য্যেরও যথেষ্ট অভাব ঘটে। আমরা নানা দিক দিয়া আলোচনা করিয়া দেখিয়া আসিয়াছি যে, স্বাভাবিকতাই আর্টের প্রাণ এবং অস্বাভাবিকতাতেই আর্টের মৃত্যু। মৃত্যুতে সৌন্দর্য্য আসিবে কিরূপে? মৃত্যু হইল তো শেষ হইল—আর্টের যেখানে মৃত্যু হইল, সেখানে তো আর্টের শেষ হইল; সেখানে সৌন্দর্য্য ও অ-সৌন্দর্য্যের বিচার করিবার আর প্রয়োজনই আসে না। প্রাণ যেখানে, সেইখানেই সুন্দর-অসুন্দরের কথা, সেইখানেই প্রকৃতি-বিকৃতির কথা। জীবনের খেলাতেই আনন্দ, জীবনের খেলাতেই সৌন্দর্য্য। কাজেই স্বাভাবিকতাতেই সৌন্দর্য্য, অস্বাভাবিকতাতে সৌন্দর্য্যের অভাব।

একালের অধিকাংশ উপন্যাসেই স্বাভাবিকতার অভাব,

সুতরাং আর্টের মৃত্যু। আর্টের যখন মৃত্যু, তখন সৌন্দর্য্য থাকে কি প্রকারে? এই জন্যই একালের উপন্যাসে সংহার বা destructionই বেশী দেখা যায়, সৃষ্টি বা construction খুব কমই দেখা যায়; ভাঙ্গনই দেখা যায়, গড়ন খুব কমই দেখা যায়; প্রলয়ের চিত্রই বেশী দেখা যায়, চরিত্র-সৃষ্টি দেখা যায় না বলিলেই চলে। দেশের যাহা কিছু ভাল, যাহা কিছু সাধু, তাহা একালের অধিকাংশ ঔপন্যাসিক ধ্বংস করিতে বসিয়াছেন দেখি; কিন্তু তাঁহারা যে তৎপরিবর্ত্তে নূতন কোন সাধু চরিত্রের সৃষ্টি করিতে পারিয়াছেন, কোন একটা ভাল আদর্শ আমাদের সম্মুখে ধারণ করিয়াছেন, তাহা তো আমাদের দৃষ্টিতে পড়ে না। তাঁহারা এদেশের উপন্যাসে বিলাতী ভাবের, বিলাতী ঢংয়ের চরিত্র ঢুকাইতে চাহেন দেখিতে পাই—ভাল; তাঁহারা যদি তাঁহাদের উপন্যাসে পাশ্চাত্য দেশের সাধুভাবের, ভাল বিষয়ের চিত্র প্রবেশ করাইতে চাহেন, এবং যদি সেই চিত্রগুলি সুন্দর সজ্জায় সজ্জিত করিয়া প্রবেশ করাইতে পারেন, তবে তাহাতে কাহার আপত্তি হইতে পারে? এবং আপত্তি করিলেই বা তাহা গ্রাহ্য হইবে কেন? কিন্তু আমাদের আপত্তির কারণ হইতেছে এই যে, তাঁহারা বিলাতী ভাল বিষয় বা সাধু চরিত্র তো আমাদিগকে দেখাইতেছেন না; যত মন্দ ভাব, মন্দ চরিত্রগুলির উপর এদেশী ঢংয়ের রং এক পোঁছ বুলাইয়া তাহাই শতসহস্র আকারে আমাদের সম্মুখে ধরা

হইতেছে। একালের যে উপন্যাসই খুলিয়া দেখ, দেখিবে, কেবল নিষ্প্রয়োজনে হাহুতাশ; দেখিবে, জোর জবরদস্তি পূর্ব্বক কামজ মোহের চিত্র, প্রেমোন্মাদের ঢলাঢলি। প্রায়ই দেখা যায় যে, নায়িকা গ্রন্থের প্রথম অবধি শেষ পর্য্যন্ত প্রেমোন্মাদের বীভৎস চরিত্রের অভিনয় করিয়া চলিল, পরে সহসা একেবারে শেষে একদিনে মস্ত সাধু হইয়া বসিল—এই চিত্র নিতান্তই অসম্ভব। সাধারণত ইহা প্রকৃতির বিপরীত। এরূপ চিত্রে সৌন্দর্য্য পাওয়া যায় বলিয়া তো আমার মনে হয় না। ইহা অস্বীকার করিতে পারি না যে, একালের উপন্যাসে আর্টের বহিরঙ্গ, মাত্র বহিঃসৌন্দর্য্যটুকু যথেষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়; শব্দের বাছনি, রচনাচাতুর্য্য, ভাষার অলঙ্কার, এ সকলের যথেষ্টই বাহুল্য দেখা যায়। সেই কারণে ঐপ্রকার চিত্রের অসম্ভবপরতা সচরাচর বহিঃসৌন্দর্য্যে ঢাকিয়া গিয়া পাঠকদের দৃষ্টি এড়াইয়া যায়।

শিক্ষাবিস্তারের প্রভাবে এবং উপন্যাসবাহুল্যের কারণে লিপিকৌশল, রচনাচাতুর্য্য ও ভাষা প্রভৃতিগত সৌন্দর্য্যের উপর একালের অনেক ঔপন্যাসিকেরই যে বিশেষ অধিকার জন্মিয়াছে তাহা জানা কথা। কিন্তু সেই অধিকারকে তাঁহারা অনেক স্থলেই সুপথে পরিচালিত করিতেছেন বলিয়া মনে হয় না। অশ্লীল ও অমঙ্গলপ্রদ বিষয়সমূহের উপরেই তাঁহা-দের অনেকেই সেই অধিকার ও ক্ষমতা নিয়োগ করেন।

একালের অনেক উপন্যাসেই দেখা যায় যে, যে বিষয়টী যত অশ্লীল ও দুর্নীতিপোষক, সেই বিষয়টীকে ততই সৌন্দর্য্যমণ্ডিত করিয়া প্রকাশ করা হয়। একালের ঔপন্যাসিকদিগের মধ্যে এই প্রথাটী বহুলপ্রচলিত হইয়া পড়িয়াছে।

তাঁহাদিগের দোষ দিই বা কি প্রকারে? তাঁহারা এই প্রথাটীকে বহুলপ্রসারিত করিয়া তুলিলেও, উপন্যাসের জন্মদাতা বঙ্কিমচন্দ্র হইতেই এই প্রথার উৎপত্তি। ঐ যে তিনি তাঁহার চন্দ্রশেখরের প্রারম্ভেই প্রতাপ ও শৈবলিনীকে "দুধের বয়সে" কামজ প্রেমের পঙ্কে হাবুডুবু খাওয়াইয়া পরিণামে নদীগর্ভে ডুব-জল খাওয়াইয়াছেন, ইহার অন্তরে অন্তরে একটা অন্যায় ভাব যে ঘুরিতেছে, তাহা সকলেই বুঝিতে পারেন; এবং গ্রন্থকারও যে তাহা না বুঝিয়াছিলেন তাহা মনে হয় না। যাই হৌক, এই অশ্লীল ইঙ্গিতব্যঞ্জক বিষয়ের উপর গ্রন্থকার যে প্রকার বহিঃসৌন্দর্য্য ঢালিয়া দিয়াছেন, তাহা দেখিলে অবাক হইতে হয়।

আমরা এবিষয়ের অধিক দৃষ্টান্ত দেওয়া আবশ্যক মনে করি না। আমরা এপর্য্যন্ত যাহা বলিয়া আসিয়াছি, তাহা অনুধাবন পূর্ব্বক আলোচনা করিলেই আমাদের এবিষয়ে বক্তব্য পাঠকবর্গের অন্তরে স্পষ্ট উপলব্ধ হইবে। বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রন্থ হইতে এইপ্রকার বিষয়ের আর একটী দৃষ্টান্তমাত্র উল্লেখ করিতে চাহি—সেটী তাঁহার বিষবৃক্ষে দেবেন্দ্রের বৈষ্ণবীসাজে

নগেন্দ্রের অন্তঃপুরে গমন। দেবেন্দ্রের এই কার্য্য গ্রন্থকার যে নীতিবিরুদ্ধ বলিয়া জানিতেন এবং পাঠকদিগকে তাহা জানাইতে চাহেন, তাহা তাঁহার বর্ণনা হইতে বেশ বোঝা যায়। কিন্তু এই নীতিবিরুদ্ধ ও দুর্নীতিপোষক কার্য্যও এমন সুন্দরভাবে বর্ণিত হইয়াছে, বহিঃসৌন্দর্য্যে এমন সুন্দর মণ্ডিত হইয়াছে যে, তাহার ফলে নবযুবক পাঠকদিগের মনে এইপ্রকার নীতিবিরুদ্ধ কার্য্যের বিরুদ্ধে দাঁড়াইবার ইচ্ছা জাগ্রত হওয়া দূরে থাক্; বরঞ্চ আমাদের আশঙ্কা হয় যে, এইপ্রকার বর্ণনা তাঁহাদিগকে সৌন্দর্য্যের ছটায় মুগ্ধ করিয়া ঐপ্রকার দুর্নীতিপর কার্য্যের প্রতি তাঁহাদের স্বাভাবিক ঘৃণা মন্দীভূত করিবে। এই সকল চিত্রের সম্মুখস্থ কারুকার্য্যখচিত কিংখাব প্রভৃতি বহুমূল্য আবরণের পরদা একটুখানি সরাইয়া ফেলিলেই ভিতর হইতে দুর্নীতির কালিমা-মাখা এক বীভৎস মূর্ত্তি পাঠকদিগকে অট্টহাস্যে উপহাস করিতে থাকে।

বঙ্কিমচন্দ্রের পর রবীন্দ্রনাথ যখন সেকালের ও একালের মধ্যবর্ত্তী সেতুস্বরূপে উপন্যাসের ধারা বজায় রাখিবার জন্য দাঁড়াইলেন, তখন তিনি যদি ঐ অন্যায় প্রথার বিরুদ্ধে দাঁড়াইতেন, তাহা হইলে বোধ হয় আমাদের এত কথা কহিয়া পাঠকদিগকে বিরক্ত করিতে হইত না। কিন্তু দুঃখের বিষয় রবীন্দ্রনাথও তাহার বিরুদ্ধে দাঁড়াইবার পরিবর্ত্তে ঐ প্রথা প্রকারান্তরে সমর্থন করিয়া বসিলেন। তিনিও তাঁহার

বৌঠাকুরাণীর হাটে ঐ স্ত্রীবেশে রমাইভাঁড়কে প্রতাপাদিত্যের অন্তঃপুরে প্রবেশ করাইলেন। বেশ বোঝা যায় যে রবীন্দ্রনাথ এই চিত্রটীকে যথেষ্ট পরিমাণে পাঠকদিগের চিত্তহরণের উপযুক্ত সুন্দর সজ্জায় সজ্জিত করিবার চেষ্টা পাইয়াছেন। তার পর, মঙ্গলার সেই "গুণ" করিবার উপযুক্ত বিষ প্রস্তুতকরণের ঘটা— গ্রন্থকার কেন যে এই চিত্রটীকে এত সুনিপুণভাবে ও এত পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অঙ্কিত করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন,—মন্দ বিষয়কে সমধিক চিত্তাকর্ষকরূপে অঙ্কিত করিবার অভিপ্রায় ব্যতীত তাহার আর তো কোনই কারণ খুঁজিয়া পাই না। এই প্রকার চিত্রগুলিকে, একপ্রকার অত্যন্ত পূতিগন্ধময় অথচ সুদৃশ্য ফুল আছে, কেবল তাহারই সহিত তুলনা দেওয়া যাইতে পারে।

রবীন্দ্রনাথের বৌঠাকুরাণীর হাট ছাড়িয়া দিয়া তাঁহার একালের উপন্যাস ধরিলে তো কথাই নাই। তাঁহার নষ্টনীড়, চোখের বালি প্রভৃতি গ্রন্থে মন্দ বিষয়কে বহিঃসৌন্দর্য্যে আচ্ছাদিত করিয়া প্রকাশ করিবার প্রথা যথেষ্ট প্রসার লাভ করিয়াছে। আর, যখন বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ কর্ত্তৃক ঐ প্রথাটী এপ্রকার বিশেষভাবে সমর্থিত হইল, তখন তাঁহাদের পরবর্ত্তী একালের ঔপন্যাসিকদিগের পক্ষে তাঁহাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া যশমান লাভ করিবার লোভ সম্বরণ করা অস্বাভাবিক ও অসম্ভব। আমরাও দেখি যে, একালের অনেক সুপ্রসিদ্ধ উপন্যাসলেখক এই পথটী খুব

বিস্তৃতভাবে উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছেন। এই সকল চিত্র যাহার দোহাই দিয়া প্রকাশ কর না কেন, অমঙ্গল আনয়ন করিবেই। আমাদের মনে পড়ে, একটা ভীষণ ডাকাতির অপরাধীরা ধরা পড়িলে বিচারকালে স্বীকার করে যে, তাহারা সেই ডাকাতির কলকৌশল বায়স্কোপ হইতে শিক্ষা করিয়াছিল। উপন্যাস-লেখকদিগেরও সেইরূপ মনে রাখা কর্ত্তব্য যে তাঁহাদের উপন্যাস কেবল আমোদ দিবার জন্য অথবা তাঁহাদের নিজেদের ধনমান আনয়ন করিবার জন্য নহে; কিন্তু ভবিষ্যৎ বংশপরম্পরাকে ভাল বা মন্দের পথে দাঁড় করাইবার জন্য, দেশের সাধু বা অসাধু সন্তান গঠিত করিবার জন্যই লিখিত হয়। লেখকেরাই বিচার করুন যে, তাঁহাদের ছেলেমেয়েদিগকে কোন্ ভাবে গঠিত করিবেন।

আমাদের অনুরোধ এই যে, তাঁহারা পরকীয়াপ্রেম-সাধন বা প্রিয়া-সাধনের চিত্র অঙ্কিত করা কিছুদিনের জন্য একেবারে বন্ধ করিয়া দিন, এবং রমণীর মাতৃত্বে শ্রদ্ধার চিত্র, অনুপম বাৎসল্যের চিত্র প্রভৃতি অঙ্কিত করিয়া দেশের সুকোমল প্রকৃতিসিদ্ধ ভাবগুলি ফুটাইয়া তুলুন, তাঁহাদের সমস্ত শক্তি সেইগুলিকে সুন্দর মূর্ত্তিতে প্রকাশ করিবার দিকে নিযুক্ত করুন। দেশের শ্রী অন্যতর হউক। ইহার বিপরীতে তাঁহারা যদি ক্রমাগত বিলাতী পাপচিত্রগুলিই ছেলেমেয়েদের সম্মুখে সুন্দর আকারে ধারণ করেন, তবে তাহারা সেইগুলির চিন্তায়

অভ্যস্ত হইয়া গিয়া সেইগুলিকেই স্বাভাবিক মনে করিবে; তখন তাহারা পাপের চিন্তায়, পাপ অনুষ্ঠানে স্বভাবতই অভ্যস্ত হইয়া উঠিবে, দেশ পাপের ভরায় ভরিয়া উঠিবে—সে চিত্র মনে করিলেও প্রাণ আকুল হইয়া উঠে।

ইতি শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর কথিত "আর্ট ও সাহিত্য"
কথায় আর্টের বহিরঙ্গ ও একালের উপন্যাস
বিষয়ক উনবিংশ কথা সমাপ্ত।

ঃ০ঃ

বিংশ কথা—আর্ট ও অধ্যাত্ম।

আমরা এ পর্য্যন্ত যাহা দেখিয়া আসিয়াছি, তাহা হইতে এই-টুকু বুঝিয়াছি যে, সাহিত্যক্ষেত্রে আর্টের প্রয়োগে প্রকৃত সাফল্য লাভ করিতে ইচ্ছা করিলে কেবল বহিঃসৌন্দর্য্য প্রয়োগের প্রতি সমস্ত মনোযোগ অর্পণ করিলে চলিবে না ; কিন্তু তদ্ব্যতীত (১) ভগবানকে আর্টের কেন্দ্র করিতে হইবে, (২) মঙ্গল-ভাবকে আর্টের লক্ষ্য রাখিতে হইবে, (৩) প্রকৃতিকে আর্টের ভিত্তি করিতে হইবে এবং (৪) স্বাভাবিকতাকে আর্টের প্রাণরূপে রক্ষা করিতে হইবে। উপরোক্ত কয়টী বিষয়ের মধ্যে একমাত্র বহিঃসৌন্দর্য্যই আর্টের সর্ব্বপ্রধান প্রত্যক্ষগোচর বহিরঙ্গ। অবশিষ্ট চারিটীর মধ্যে প্রথম দুইটীর সঙ্গে প্রধানতঃ আর্টিষ্টের নিজের অন্তরেরই যোগ খুব বেশী—আর্টিষ্টের নিজের আত্মা দ্বারাই বুঝিতে হইবে যে, তিনি ভগবানকে তাঁহার আর্টের কেন্দ্রে রাখিয়াছেন কিনা, এবং মঙ্গলভাবকে তাঁহার আর্টের লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য করিয়াছেন কিনা। আবার পাঠকেরাও যে উপন্যাস পড়িবেন, তাঁহাদের আত্মা দ্বারাই বিচার করিয়া দেখিতে হইবে যে, সেই উপন্যাসে মঙ্গলভাব নিহিত করা হইয়াছে কিনা। শেষ দুইটীকে কতকাংশে আর্টের বহিরঙ্গ বলিয়া ধরা যাইতে পারে বটে, কিন্তু সেই দুইটীরও সঙ্গে আমাদের অন্তরাত্মার একটা বিশেষ যোগ বা সম্বন্ধ আছে দেখা যায়। প্রকৃতির যে কোন অংশ আর্টের ভিত্তি হইতে পারে না ; প্রকৃতির যে অংশ আর্টিষ্ট,

এক্ষেত্রে ঔপন্যাসিক, তাঁহার নিজের আত্মা দ্বারা বিচার করিয়া সৌন্দর্য্যপূর্ণ অথবা সৌন্দর্য্যবিকাশের উপযুক্ত বিবেচনা করিবেন, সেই অংশকেই তিনি তাঁহার আর্টের ভিত্তি করিয়া লইবেন। এইপ্রকারে প্রকৃতির সৌন্দর্য্যমূলক অংশ লইলে পর, আর্টিষ্টকে এবং সঙ্গে সঙ্গে পাঠককেও অন্তরে আলোচনা করিয়া দেখিতে হইবে যে, ঐ অংশ স্বাভাবিক কি না অর্থাৎ দেশ, কাল ও অবস্থার উপযোগী কি না। এই চারিটী বিষয়ই প্রধানত আমাদের অন্তরাত্মারই গ্রহণীয় বলিয়া আমরা এই কয়টীকেই আর্টের অধ্যাত্ম বিষয় বলিব। এই কয়টী অধ্যাত্ম বিষয় যে কোন আর্টের বস্তুতে যথাযথ সমাবেশিত হইলে পর, আর্টিষ্ট তাহাতে যথোপযুক্ত বহিঃসজ্জা প্রয়োগ করিবেন এবং পাঠক চক্ষুকর্ণাদি ইন্দ্রিয়ের দ্বারা সেই বহিঃসৌন্দর্য্য উপভোগ করিবেন।

এইপ্রকারে দেখা যাইতেছে যে, অধ্যাত্ম বিষয় বা ভাবই আর্টের স্ব-ভাব বা প্রকৃতি অর্থাৎ আর্টের সঙ্গে অধ্যাত্ম বিষয় বা ভাবেরই ঘনিষ্টতম যোগ। গীতাতেও বোধ হয় সমস্ত বিশ্ব-প্রকৃতিকে বিশ্বপতি ভগবানের আর্টহিসাবে দেখিয়াই তাঁহার স্ব-ভাবকেই অর্থাৎ তাঁহারই নিশ্বসিত এই বিশ্বপ্রকৃতির অন্তর্নিহিত ভাবকেই অধ্যাত্ম বলা হইয়াছে—"স্বভাবোঽধ্যাত্মমুচ্যতে"। আর দেখাও যায় যে, অধ্যাত্মবিষয়কে অবলম্বন করিয়াই প্রাচ্য ও প্রতীচ্য আর্টের কি প্রকার উন্নতি সাধিত হইয়াছে। প্রতীচ্য ভূখণ্ডে ড্রুইড ধর্ম্ম, গ্রীক ও রোমানদিগের

প্রাচীনধর্ম্মসম্বলিত অধ্যাত্ম বিষয় লইয়াই কত চিত্র, কত সঙ্গীত, কত ভাস্কর্য্য জাগ্রত হইয়া উঠিয়াছিল। খৃষ্টধর্ম্মের আবির্ভাবের ফলে সেখানে আবার কত নবতর অধ্যাত্ম বিষয় লইয়া কত নূতন নূতন আর্টের বস্তু দেখা দিতে লাগিল। এই প্রাচ্য ভূখণ্ডেও কোথায় এই ভারতবর্ষ, আর কোথায় চীন ও জাপান—যেখানেই যাও, বৌদ্ধধর্ম্মের সংস্পর্শে যেসকল আর্টের বস্তু দেখা দিয়াছে, পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা সেই সকল আলোচনা করিয়া আজও শেষ করিতে পারিতেছেন না। অধিক কথায় প্রয়োজন নাই; অধ্যাত্মভাবের উপর দাঁড়াইয়া এই ভারত-ভূমিতে রামায়ণ মহাভারত প্রভৃতি যে সকল মহাকাব্য আবির্ভূত হইয়াছে, আজ পর্য্যন্ত সমগ্র জগতে তাহার তুলনা পাওয়া যায় নাই। অধ্যাত্ম-বহির্ভূত যে সকল বিষয়ের উপর আর্ট ফলাইবার চেষ্টা হইয়াছে, সেইসকল বিষয় যতই অধ্যাত্মের ছায়া বা সংস্পর্শ লাভ করিয়াছে, তদনুপাতেই সেই চেষ্টা প্রকৃত সাফল্য লাভ করিয়াছে দেখা যায়। এই কারণেই ভারতের অধঃপতনকালে প্রচারিত নিয়ম অনুসারে মহাকাব্যসমূহে আদিরসের যেসকল ঘৃণিত চিত্র দেওয়া হয়, সেই চিত্রগুলি সাধারণ পাঠকের অন্তরে একটা ঘৃণ্য বীভৎস রসের উদ্রেক করে; কিন্তু পবিত্র বাৎসল্যভাব বা পবিত্র দাম্পত্যপ্রেমের সংস্পর্শসিক্ত চিত্র, ঐ সকল ভাবে আচ্ছাদিত হইবার অনুপাতেই আমাদের হৃদয়মন হরণ করিতে উদ্যত হয়।

অধ্যাত্ম বিষয়ের উপর আর্টকে দাঁড় করাইতে গেলে কোন বিষয়েই অশ্লীলতা বা অস্বাভাবিকতার চিত্র বহুলপ্রচারিত হইতেই পারে না। প্রকৃতির অধ্যাত্ম বা স্ব-ভাব স্বভাবতই অশ্লীল ও অস্বাভাবিক ভাবের বিরোধী। প্রকৃতি কোন্ প্রকার বিষয় হইতে আমাদিগকে আর্ট শিখাইতে চাহেন, তাহা আমরা "আর্ট ও প্রকৃতি" প্রবন্ধে দেখিয়া আসিয়াছি। আমরাও যখন প্রকৃতিরই এক অংশ, তখন বলা বাহুল্য যে, মানবের স্ব-ভাবও অশ্লীল ও অস্বাভাবিক ভাবের স্বভাবতই বিরোধী। তাহা যদি না হইত, তবে তো মানব চিরকালই সেই আদিম কালের অসভ্য অবস্থাতেই জীবন যাপন করিতে বাধ্য হইত, উন্নতির পথে মানবের অগ্রসর হইবার কোনই সম্ভাবনা থাকিত না। মানব নিজের স্ব-ভাবে দাঁড়াইলে ধর্ম্মকেও ভড়ং বলিতে পারে না, অথবা ভগবানকে পুরাকালের নিষ্ফল কল্পনা বলিয়াও উড়াইয়া দিতে পারে না। কারণ, মানব জানে যে, যে ভগবান আর্টের কেন্দ্র, তিনিই এই বিশ্বেরও অধিপতি; সুতরাং যে ধর্ম্মের নিয়মে এই বিশ্ব-জগত পরিচালিত হইতেছে, সেই ধর্ম্মের প্রবর্ত্তকও তিনিই। তাঁহার সত্তা মানবের অন্তরে দিবানিশি জাগ্রত হইয়া আছে— তাঁহাকে অতিক্রম করিয়া মানব একটী পদও নিক্ষেপ করিতে পারে না, একটী চিন্তাও করিতে পারে না। বিজ্ঞান ও দর্শন, জ্ঞানের সকল বিভাগই সপ্রমাণ করিতেছে যে, এই সত্য-শিব-

সুন্দর ভগবান মানবের অন্তরে থাকিয়া, সমস্ত বিশ্বের অন্তরে থাকিয়া বিশ্বসংসারকে কল্যাণের পথে; উন্নতির অভিমুখে পরিচালিত করিতেছেন।

ইহা অবশ্য সত্য যে, সাধারণত মানবস্বভাব অশ্লীল ও অস্বাভাবিক ভাবের বিরোধী হইলেও উপন্যাসলেখকেরা অনেক সময়ে অস্বাভাবিকতা ও অশ্লীলতার ইঙ্গিতে মাখানো চিত্র-গুলিকে সুসজ্জিত করিয়া পাঠকদিগের সম্মুখে ধারণ করিয়া তাঁহাদিগকে প্রলুব্ধ করেন এবং তাঁহাদিগের অন্তরে মন্দভাবের প্রতি একটা নূতন অভিরুচি সৃষ্টি করেন—জাগাইয়া তুলেন। সেই নবজাগ্রত অভিরুচির স্রোতে পাঠকদিগের অশ্লীলতা-বিরোধী ভাব অনেক সময়ে কোথায় ভাসিয়া যায়; এবং তখন অশ্লীল বিষয় পড়িতে, অস্বাভাবিক ভাবের আলোচনা করিতে তাঁহাদিগের প্রবৃত্তি জন্মে। তখন আবার, ঐ সকল লেখক সুবিধা পাইয়া পাঠকদিগের সেই নবার্জিত অভিরুচির উপযোগী উপন্যাসাদি প্রকাশ করিয়া তাহাতে ইন্ধন যোগাইবার ব্যবস্থা করেন। এই প্রকারে আর্টিষ্ট ও আর্টের উপভোক্তা, উপন্যাস-লেখক ও উপন্যাস-পাঠক, উভয়েই পরস্পর পরস্পরকে মন্দ পথে অগ্রসর করিবার সহায়তা করিতে থাকেন। বলা বাহুল্য যে, এই পথ আর্টের সম্পূর্ণ বিরোধী। ইহা দ্বারা প্রকৃত আর্ট ধ্বংসেরই অভিমুখে অগ্রসর হয়।

এই পথকে প্রতিরুদ্ধ করিতে চাহিলে আমাদিগের ব্রহ্মচর্য্যে

প্রতিষ্ঠিত হওয়া আবশ্যক। আর্ট প্রতিষ্ঠার জন্য মানুষের মনে যে স্ফূর্ত্তি আবশ্যক, যে আনন্দ আসিলে সৌন্দর্য্যবোধ সহজে আসিতে পারে, ব্রহ্মচর্য্য ব্যতীত সে স্ফূর্ত্তি, সে আনন্দ আসিতে পারে বলিয়া মনে হয় না। ব্রহ্মচর্য্যেই আর্ট-প্রতিষ্ঠার উপযোগী শরীরে বল আসে, হৃদয়ে তেজ আসে, এবং আত্মজ্ঞান স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হয়। সুখের বিষয়, আর্টে অশ্লীলতা-প্রতিরোধী একটা বাতাস উঠিয়াছে, কিন্তু সে বাতাসে পালে জোর লাগিবে বলিয়া মনে হয় না। আমরা তো দেশের ছেলেমেয়েকে একমাত্র ব্রহ্মচর্য্যে প্রতিষ্ঠিত করা ব্যতীত অন্য কোন উপায়ে ইহা সম্যক প্রতিরুদ্ধ হইবার সম্ভাবনা দেখি না।

আমাদের শ্রদ্ধাস্পদ বন্ধু শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সিংহ তাঁহার "সাহিত্যের স্বাস্থ্যরক্ষা" গ্রন্থে বাল্যবিবাহকে love বা প্রেম-রোগের প্রতিষেধক বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। আমাদের ধারণা কিন্তু ইহার বিপরীত। আমরা দেখি যে, এদেশে বাল্যবিবাহ অনেক স্থলে love বা প্রেমরোগের প্রতিষেধক হইবার পরিবর্ত্তে পরিপোষক হইয়া পড়ে। বাল্যবিবাহের ফলে, যেস্থলে স্বামীস্ত্রীর পূর্ণ যৌবনলাভের পর পরস্পরের ঠিক মনের মিল হইল না, তেমন অনেক স্থলে স্বামীকে পরকীয়াপ্রেমের সাধনে যাইতে দেখা যায়। কাজেই তখন এইপ্রকার বিপথগামী স্বামীদিগের নিকট উচ্ছৃঙ্খলভাবের পরিপোষক উপন্যাসগুলি যে প্রীতিপ্রদ মনে হইবে তাহা বলা বাহুল্য। এই প্রকারে

প্রকারান্তরে বাল্যবিবাহ অশ্লীল ও অস্বাভাবিক উপন্যাসের সহায়তাই করে, সুতরাং আর্টের পরিপন্থীই হইয়া দাঁড়ায় দেখি। বাল্যবিবাহ যদি প্রেমরোগের প্রতিষেধক হইত, তবে এদেশে আজ বহুকাল যাবৎ বাল্যবিবাহ প্রচলিত থাকা সত্ত্বেও পরকীয়া-প্রেম প্রভৃতি কামজ মোহ-সঞ্জাত প্রেমের অপভ্রংশের এদেশে আমদানি হইল কিপ্রকারে? বাল্যবিবাহ আর এক দিক দিয়াও আর্টের পরিপন্থী হইয়া দাঁড়ায়। যে দাসত্ব কেবল এদেশের আর্ট কেন, আমাদের অস্থিমজ্জা ভাঙ্গিয়া দিতেছে, প্রকারান্তরে বাল্যবিবাহই সেই দাসত্বের মূল। কেবল যে পরকীয়াপ্রেম-সাধনেই ব্রহ্মচর্য্যের ব্রতভঙ্গ হয় তাহা নহে, স্বকীয়া স্ত্রীর সহিত অযথাব্যবহারেও ব্রহ্মচর্য্যের সমূহ হানি হয়। স্বামীর গৃহে অন্নসংস্থান নাই, অথচ "বর্ষে বর্ষে পুত্র কন্যা আসে যেন প্রবল বন্যা"; এবং সেই সকল দুর্ভাগ্য পুত্রকন্যাদিগের জন্য অভাগা স্বামী হা অন্ন জো অন্ন করিয়া চিরজীবনের জন্য দাস-খত লিখিয়া দিতে প্রস্তুত হয়। তখন দাসত্বের নিষ্পেষণে স্বামীর গৃহে ফিরিয়া আর ভাল গ্রন্থ পড়িতে প্রবৃত্তি হয় না, আপাতত মুখরোচক যাহা কিছু পায়, সে তাহাই গিলিতে থাকে। কাজেই বাল্যবিবাহ-প্রসূত দাসত্বের ফলে আর্ট যে কোথায় অন্তর্হিত হয়, তাহার ঠিকানাই পাওয়া যায় না।

পক্ষান্তরে দেখি যে, পাশ্চাত্য দেশে যৌবনবিবাহ প্রচলিত থাকা সত্ত্বেও তাহা কামজ মোহ ও তজ্জনিত নানাবিধ কুফল

প্রতিরুদ্ধ করিতে সমর্থ হয় নাই। আবার, এদেশে সাঁওতাল প্রভৃতি জাতির মধ্যে যৌবনবিবাহও প্রচলিত আছে, অথচ তাহাদিগের মধ্যে পরকীয়াপ্রেম-সাধনের কোন কথাই উঠে না। কাজেই বুঝা যাইতেছে, বাল্যবিবাহ বা যৌবন-বিবাহ, তাহার সহিত ঐ কামজ ভাবের আবির্ভাব বা তিরো-ভাবের বিশেষ কোন নিকট-সম্বন্ধ নাই। সকল দিক আলো-চনা করিয়া আমাদের স্থির বিশ্বাস দাঁড়াইয়াছে এই যে, ব্রহ্মচর্য্য এদেশে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত না হইলে আমাদের দাসত্বও কিছুতেই ঘুচিবে না এবং বর্ত্তমান অশ্লীল ও অস্বাভাবিক চিত্রে পূর্ণ উপন্যাসের বিরুদ্ধেও আমরা কিছুতেই প্রবল শক্তিতে দাঁড়াইতে পারিব না এবং প্রকৃত আর্টকেও দাঁড় করাইতে পারিব না। নানা বিপ্লবের ফলে, ভারতের ব্রহ্মচর্য্য শিক্ষা দিবার প্রাচীন প্রথা যখন ভাঙ্গিয়া গেল, তখন অব-ধিই পূর্ব্বরাগ, পরকীয়া-প্রেম প্রভৃতির কথা উঠিতেই পারিল। ব্রহ্মচর্য্যে প্রতিষ্ঠিত হইলে দাসত্ব স্বীকারে স্বতই ঘৃণা আসিবে; অশ্লীল আমোদপ্রমোদ, অশ্লীল ভাবভঙ্গীর প্রতি একটা স্বাভাবিক ঘৃণা ও অশ্রদ্ধা আসিবে; ব্রহ্মচর্য্যের পরিপন্থী কুপ্রথাসকল দূর হইয়া সুপ্রথাসমূহের এক আশ্চর্য্য সুগন্ধ বায়ু প্রবাহিত হইবে।

তবেই দেখিতেছি যে, আর্টে প্রকৃত সাফল্য লাভ করিতে গেলে সর্ব্বপ্রথম ব্রহ্মচর্য্যে প্রতিষ্ঠিত হইতে হইবে; তাহার পর,

—আর্টের বিষয়ে বহিঃসৌন্দর্য্য প্রদানে সিদ্ধহস্ত হইতে হইবে; প্রকৃতিকে আর্টের ভিত্তি করিয়া তাহার মধ্যে স্বাভাবিকতা জাগাইয়া রাখিতে হইবে; মঙ্গলভাবের প্রতি স্থিরদৃষ্টি রাখিতে হইবে; এবং সর্ব্বোপরি ভগবানকে আর্টের কেন্দ্রে রাখিতে হইবে।

ইতি শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর কথিত "আর্ট ও সাহিত্য"
কথায় আর্ট ও অধ্যাত্ম বিষয়ক
বিংশ কথা সমাপ্ত।

একবিংশ কথা—আর্টের কথাটী ফুরাল।

আর্ট ও সাহিত্য সম্বন্ধে আমার যাহা বক্তব্য ছিল তাহা মোটামুটি একপ্রকার ফুরাইল। এসম্বন্ধে এত বক্তব্য অবশিষ্ট আছে যে, তাহা একজনের দ্বারা অথবা একটী গ্রন্থে সমস্ত শেষ করা যাইতে পারে না। তবে আমার যাহা কিছু বক্তব্য ছিল বা আছে, সে সমস্তেরই কেন্দ্র এই যে "প্রবৃত্তিতে মানুষকে পশু করিয়া তোলে, নিবৃত্তিই দেবত্ব গঠনের সহায়ক"। সম্প্রতি * পূজ্যপাদ রবীন্দ্রনাথ মহাত্মা গান্ধীর সবরমতি আশ্রমে ঐ কথাই সবলে বলিয়াছেন। তাই আমরা গ্রন্থের উপসংহারে উপন্যাসলেখকদিগের প্রতি সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করি এই—তাঁহাদের চরণে প্রণিপাত করিয়া ভিক্ষা চাহি এই যে,—তাঁহারা আর যেন অশ্লীল ও অস্বাভাবিক ভাবে মাখা, অশ্লীল ইঙ্গিতে পূর্ণ উপন্যাস প্রকাশ করিয়া সুকুমারমতি ছেলেমেয়েদের মনকে বিপথে লইয়া যাইবার ব্যবস্থা না করেন। তাঁহাদের শক্তিমান লেখনী পবিত্র ও কল্যাণকর ভাবসমূহের চিত্র আঁকিয়া ছেলেমেয়েদের অন্তরে পবিত্রভাব জাগাইয়া তুলুক, ব্রহ্মচর্য্য-বলে বলী করিয়া তাহাদিগকে বিপদে আপদে, দুঃখে শোকে হিমাচলের ন্যায় অচল অটল করিয়া তুলুক। দেশের মুখশ্রী ফিরিয়া যাউক।

---

* গত ১৮ই অগ্রহায়ণ। ১৭ পৌষ ১৩২৯ হিন্দুস্থান দেখ।

গ্রন্থের উপসংহারে মা-বাপের বুকচেরা ধন ছেলেমেয়েদেরও বলি—ব্রহ্মচর্য্যে প্রতিষ্ঠালাভ কর; অশ্লীল সাহিত্য, চিত্র, সঙ্গীত প্রভৃতিকে ঘৃণা ও অশ্রদ্ধার তীব্র কটাক্ষে দগ্ধ করিয়া দাও। অন্তরে এই কথাটী স্মরণ রাখিও যে, তোমাদের বিধবা মাতার শরীরে বল নাই, কেশে তৈল নাই; তাঁহার লজ্জানিবারণের বস্ত্র নাই; তাঁহার নিজের অন্ন নাই, তথাপি তিনি তোমাদিগের মুখে দুমুঠা অন্ন যোগাইবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াও কৃতকার্য্য হইতেছেন না। অশ্লীল ভাব অন্তরে পোষণ করিয়া, অশ্লীল আমোদপ্রমোদে গা ভাসাইয়া দিয়া সেই বিধবা মাতার দুঃখ কষ্ট আর বাড়াইও না, রুদ্ধ-আবেগ অশ্রুর বন্যা টানিয়া আনিও না। ব্রহ্মচর্য্যব্রতে সাফল্য লাভ করিয়া, পবিত্রতার ও মঙ্গলভাবের অক্ষয় তেজ লাভ করিয়া, ভগবানের অমিত বলে বলী হইয়া, তাঁহারই পুণ্য নামে ভারতমাতার মস্তকে সর্ব্ববিষয়ক শ্রেষ্ঠতার উজ্জ্বল মুকুট পুনঃস্থাপিত করিয়া, তবে বিশ্রাম করিবার প্রস্তাব করিও। তখন—তাহার পূর্ব্বে নহে—যে ভারত একসময়ে চতুঃষষ্টি কলাবিদ্যায় শ্রেষ্ঠতা লাভ করিয়াছিল, সেই ভারত আবার এযুগেও আর্টে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আসনের অধিকারী হইবে নিঃসন্দেহ।

দেশের প্রত্যেক সাহিত্যসেবীকে—লেখক হউন বা পাঠক হউন—এবং আবালবৃদ্ধবনিতা প্রত্যেক অধিবাসীকে ভক্তি-

ভাজন সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের কথায় এই অনুশাসন করিয়া গ্রন্থের উপসংহার করি—

মরিবে না? এসো তবে,
উন্নতি সাধিয়া সবে,
লভি নাম পৃথিবীতে, পিতৃসমতুল!
ছাড়ি' দাও খেলাধুলা,
ভাঙ্গ বাদ্যভাণ্ডগুলা
মারি' খেদাইয়া দাও নর্ত্তকীর কুল॥
মারিয়া লাঠির বাড়ি
বোতল ভাঙ্গহ পাড়ি,'
বাগান ভাঙ্গিয়া ফেল পুকুরের তলে।
সুখ নামে দিয়ে ছাই,
দুঃখ সার কর ভাই,
কভু না মুছিবে কেহ নয়নের জলে,
যতদিন বাঙ্গালীকে লোকে ছিছি বলে॥

ইতি শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর কথিত "আর্ট ও সাহিত্য"
কথায় আর্টের কথাটী ফুরাল
এবং গ্রন্থ সমাপ্ত হইল।

ওঁ

গ্রন্থকার বিরচিত হিতৈষণা গ্রন্থাবলীর তালিকা।

১। জ্ঞান ও ধর্ম্মের উন্নতি (মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক বিবৃত ও শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক লিখিত) সন ১৩০০ সাল।

২। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার অভিনব সংস্করণ সন ১৩০১ সাল।

৩। অধ্যাত্মধর্ম্ম ও অজ্ঞেয়বাদ সন ১৩০২ সাল।

৪। রাজা হরিশ্চন্দ্র (১ম সংস্করণ ৫০০) ১৩০৩ সাল।
ঐ (২য় সংস্করণ ৫০০) ১৩১৭ সাল।

৫। আর্য্যরমণীর শিক্ষা ও স্বাধীনতা ১৩০৭ সাল।

৬। অভিব্যক্তিবাদ ১৩০৯ সাল।

৭। ব্রাহ্মধর্ম্মের বিবৃতি ১৩১৬ সাল।

৮। আলাপ ১৩১৭ সাল।

* ৯। আঁখিজল ১৩১৭ সাল ডবল ক্রাউন ৮ পেজী ভাল বাঁধান ॥৶০ + ৭৯ পৃষ্ঠা মূল্য ॥০।

১০। শ্রীভগবৎ কথা (১ম সংস্করণ ৫০০) ১৩১৯ সাল।
* (২য় সংস্করণ ৫০০) ১৩২৫ রয়াল ১৬ পেজী ॥৶০ + ৬৯ + ৸৶০ পৃঃ মূল্য ॥০।

* ১১। ওঁ পিতা নোঽসি ১৩২১ সাল ডবল ক্রাউন ৮ পেজী ভাল বাঁধা পৃঃ ‖০+৭৮ মূল্য ‖০।

১২। প্রাণের কথা (১ম সংস্করণ ৫০০) ১৩২২ সাল।
(২য় সংস্করণ ৫০০) ১৩২৬ সাল।

* ১৩। আদিব্রাহ্মসমাজের মণ্ডলী সংগঠনের প্রস্তাবনা ১৩২২ সাল, ডবল ক্রাউন ৮ পেজী, পৃঃ ৪০, মূল্য ৵০।

* ১৪। বঙ্গসেনা সংগঠনে দেশের উন্নতি ১৩২৩ সাল ডবল ক্রাউন ৮ পেজী, পৃঃ ২৮, মূল্য ⁄০।

১৫। শিক্ষা-সমস্যা ও কৃষিশিক্ষা ১৩২৩ সাল।

১৬। মা—১৩২৪ সাল।

১৭। মায়ে-পোয়ে ১৩২৫ সাল।

* ১৮। তোমরা আর আমরা ১৩২৬ সাল ডিমাই ১৬ পেজী, পৃঃ ৯৫, মূল্য ।৵০।

১৯। স্বস্তিকা ১৩২৬ সাল।

* ২০। জর্ম্মনির বর্ত্তমান রাষ্ট্রনীতির অভিব্যক্তি ১৩২৭ সাল, ডিমাই ১৬ পেজী, পৃঃ ৬১, মূল্য ।০।

* ২১। ওপারে ১৩২৮ সাল, রয়াল ১৬ পেজী, পৃঃ ১৯২, মূল্য ৸০।

* চিহ্নিত গ্রন্থগুলি ৫৫নং আপার চিৎপুর রোড আদিব্রাহ্মসমাজ কার্য্যালয়ে পাওয়া যায় ; অবশিষ্ট গ্রন্থগুলি দুষ্প্রাপ্য হইয়া গিয়াছে।